শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য

শিবদাস ঘোষ

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)

শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য — শিবদাস ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ ৪ মার্চ, ২০২১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২

প্রকাশক ঃ অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)
৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩
ফোন ঃ (০৩৩) ২২৪৯ ১৮২৮, (০৩৩) ২২৬৫ ৩২৩৪

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩

মূল্য ঃ ৪০ টাকা

প্রকাশকের কথা

বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে সকল আলোচনা একত্রিত ও সম্পাদিত করে এই পুস্তক প্রকাশ করা হল।

শরৎচন্দ্রের উপর কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য জনসাধারণের যে চাহিদা, এই পুস্তক তা পূরণ করতে সাহায্য করবে বলে আমরা আশা রাখি।

২০২১-এর ৪ মার্চ বইটি প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হল।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০২২
৪৮, লেনিন সরণী
কলকাতা ৭০০০১৩

অমিতাভ চ্যাটার্জী
কেন্দ্রীয় কমিটি
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য

সম্পাদনা প্রসঙ্গে

"আমার অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সেবার পুরস্কার দেশের কাছে আমি অনেক দিক দিয়ে অনেক, অনেক পেলাম, — আমার প্রাপ্যের অনেক বেশি।

আজকের দিনে আমার সবচেয়ে মনে পড়ে এর কতটুকুতে আমার আপন দাবী, আর কত বড় এর ঋণ। ঋণ কি শুধু আমার পূর্ববর্তী পূজনীয় সাহিত্যাচার্য-গণের কাছেই? সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছু, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিনই ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,— এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার, কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদেরই নিয়ে।"

—নিজের সাহিত্য সাধনার উৎস সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের এই ধরনের ঐতিহাসিক উক্তি বিশ্বে অন্য কোনও সাহিত্যিক করেছেন কি না আমাদের জানা নেই।

ভারতবর্ষের নবজাগরণ ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন বিপ্লবাত্মক ধারার বলিষ্ঠ প্রতিনিধি শরৎচন্দ্রের সাহিত্য প্রকৃতই এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাই মুগ্ধচিত্তে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সার্থক ও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হিসাবে অভিনন্দিত করেছেন। এমনকি তিনি আলোচনায় প্রখ্যাত মনীষী রমঁ্যা রলঁ্যাকে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে এই মন্তব্যও করেছিলেন যে, "বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো জীবিত আর্টিস্ট"। রমঁ্যা রলঁ্যাও শুধুমাত্র 'শ্রীকান্ত -১ম পর্ব'-র অনুবাদ পড়েই বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, "ঁ্র ৺স্লন্দ্বপ্তুনব্দব্ধ ঈন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রনব্জব্দব্ধ ঈব্জস্তুন্দ্বব্জ"। এ ছাড়া শরৎচন্দ্রের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন প্রেমচন্দ, নজরুল সহ তৎকালীন ও পরবর্তীকালের সাহিত্যিকগণ। সুগভীর ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা

ব্যক্ত করেছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিন পাল, সুভাষচন্দ্র সহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় সহ জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের বিশিষ্টজনেরা। বিপ্লবীদের কাছে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ ও প্রেরণার উৎস। অন্য দিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, দেশীয় পুঁজিবাদ, রক্ষণশীল সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডূকতায় আচ্ছন্ন সমাজ, কায়েমি স্বার্থবাদী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসমুখী বিপ্লববিরোধী নেতৃত্ব তাঁকে বিপজ্জনক রূপে গণ্য করেছিল। আবার বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত কিছু সমালোচক শরৎ সাহিত্য আলোচনায় নিজেদের অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই তাঁর সাহিত্য বারবার অনূদিত হয়েছে, অগণিত পাঠকের হৃদয় জয় করে তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

সমাজ বিকাশের কোন স্তরে কী প্রয়োজনে তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু হয়েছিল, সামাজিক সমস্যা অনুসন্ধানে, অনুধাবনে ও সমাধানে কোন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তিনি এই অসাধারণ সাহিত্য শিল্প-দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তাঁর সাহিত্যের সঠিক বিচার কী, সেই যুগের শ্রেণিসংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর অবস্থান কী ছিল, আজকের যুগে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে তাঁর সাহিত্য চিন্তা ও শিল্পশৈলীর প্রাসঙ্গিকতা কী এবং কী কী আজও অনুসরণীয় ও কী ভাবে গ্রহণীয়— এই সব নানা প্রশ্ন আজকের দিনের সমাজ প্রগতির যোদ্ধাদের মধ্যে এবং চিন্তাশীল মহলে স্বাভাবিকভাবেই এসে গেছে।

এই সব প্রশ্ন এবং দর্শনগত ও মনস্তাত্ত্বিক আরও নানা প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক ও দার্শনিক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে ছ'বার শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে খুবই মূল্যবান আলোচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও ঘরোয়া কর্মী-বৈঠকেও শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। স্থির হয়েছিল এগুলি একত্রিত ও সম্পাদিত করে তাঁর গাইডেন্সে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু ওই সময়ে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ঘটনাবলিতে তিনি ব্যস্ত থাকায় এবং পরবর্তী সময়ে কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকায় এই প্রকাশনা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই ১৯৭৫ সালে শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে উপরোক্ত বক্তৃতাগুলির কিছু কিছু নির্বাচিত ক্ষুদ্র অংশ সংকলিত করে তাঁরই অনুমোদন নিয়ে 'শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

পুস্তিকাটি জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষ থেকে বিদ্বজ্জন— সকল অংশের কাছেই পুস্তিকাটি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়। তাই শুধু নয়, একজন

মার্কসবাদী রাজনীতিবিদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা করতে পারেন, শরৎচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভাকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করে এ ভাবে তুলে ধরতে পারেন — অনেকের কাছেই এটা অভাবনীয় ছিল। মুগ্ধ আকর্ষণে হাজার হাজার মানুষ পুস্তিকাটি সংগ্রহ করেন। দলের নেতা-কর্মীরাও সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্য বিচারের সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে সমৃদ্ধ হন। মুদ্রণের পর মুদ্রণ করেও চাহিদা শেষ হয়নি। লক্ষ লক্ষ কপি ছাপা চলছেই। ইংরেজি, হিন্দি তো বটেই, অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাতেও পুস্তিকাটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যেহেতু শরৎচন্দ্র ভারতের প্রায় সকল ভাষাভাষী মানুষেরই অত্যন্ত প্রিয় সাহিত্যিক। তখন থেকেই এ বিষয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়ার জন্য প্রবল চাহিদা সৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষের নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসমুখী ও আপসহীন ধারার পার্থক্য কোথায়, সেক্যুলার মানবতাবাদের বৈশিষ্ট্য কী কী, রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি কী হতে পারে থেকে শুরু করে শরৎ সাহিত্যে আপসহীন মানবতাবাদী ধারার কী ভাবে সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটেছে, শরৎচন্দ্রের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি কী, সর্বোপরি সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে ও বিশ্বের উপন্যাস সাহিত্যে শিল্পশৈলীতে কেন ও কোথায় তিনি শ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার অপরিহার্য প্রয়োজনে একমাত্র শরৎচন্দ্র সৃষ্ট সেক্যুলার মানবতাবাদী সাহিত্যের ধারাবাহিকতায় ও বিকাশের পথেই ছেদ ঘটিয়ে যে সর্বহারা সংস্কৃতি সৃষ্টি হতে পারে— এ সব নানা বিষয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ অসাধারণ প্রজ্ঞায় বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

১৯৭৬ সালের ৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন হয়ে গেছে আমরা এই পুস্তিকা প্রকাশনায় হাত দিইনি। কমরেড শিবদাস ঘোষ সামান্য কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া কোনও দিন সভায় লিখিত ভাষণ দেননি। ১৯৬৬ সাল থেকে টেপ রেকর্ডারে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা সম্ভব হয় এবং তখন থেকে তাঁরই গাইডেন্সে সেই বক্তব্যগুলি সম্পাদিত করে বেশ কিছু পুস্তক হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই সুযোগ্য অনুগামী, সহযোদ্ধা ও পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক প্রয়াত কমরেড নীহার মুখার্জীর সম্পাদনায় আরও কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। কমরেড নীহার মুখার্জী শরৎচন্দ্র সম্পর্কিত বক্তৃতাগুলি সম্পাদনার দায়িত্ব একজন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে দিয়েছিলেন, যিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের গাইডেন্সে এই কাজে কিছু দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও কাজটি করে যেতে পারেননি। তিনি কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন। এ কথা ঠিক যে একটি বক্তৃতা সম্পাদনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু ছয়টি বক্তব্য ও

কিছু আলোচনার লিখিত নোট একত্রিত করে সম্পাদনা করা খুবই দুরূহ, বিশেষত কমরেড শিবদাস ঘোষের অনুপস্থিতিতে। আবার এই মূল্যবান সম্পদ থেকে জনসাধারণকে বঞ্চিত করা একটি অপরাধ। এই উপলব্ধি থেকে অবশেষে কয়েকজন কমরেডের অক্লান্ত সহযোগিতায় এই সম্পাদনা সম্পন্ন করে এই পুস্তক প্রকাশ করা হল। প্রকাশে বিলম্বের জন্য সকলের কাছে মার্জনা চাইছি। সম্পাদনায় ত্রুটি ঘটে থাকলে, তার দায়িত্ব একান্তই আমার।

৪ মার্চ, ২০২১
এস ইউ সি আই (সি) অফিস
৪৮, লেনিন সরণী,
কলকাতা ৭০০০১৩

ধন্যবাদান্তে
প্রভাস ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক,
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

শরৎচন্দ্রের চিন্তা ও সাহিত্য

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনদর্শন ও তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে প্রথমেই আপনাদের কাছে একটা কথা বলে রাখতে চাই যে, শুধু শরৎচন্দ্রই নয়, আমাদের দেশের নবজাগরণের যুগ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের ঠিক একেবারে টগবগে যে সময়টাতে এদেশে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব, তদানীন্তন সময়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের আরও যাঁরা দিকপাল বা সমাজে অন্যান্য চিন্তানায়করা ছিলেন, তাঁদেরও সঠিক মূল্যায়ন করা নিয়ে এই ধরনের আলোচনা আজ খুবই দরকার বলে আমি মনে করি। বিশেষ করে আজকে আমরা যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, মূল্যবোধ আমাদের যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, সাংস্কৃতিক মান যে জায়গায় নেমেছে, এরকম একটা সময়ে যদি আমরা ভবিষ্যতের রাস্তা পেতে চাই, তাহলে আমাদের ঠিক আগের যে যুগটা, সেই যুগটাকে ভাল করে জানতে হবে। কারণ, সেই অতীতটাকে সঠিকভাবে বুঝলেই সেই ধারার উত্তরাধিকারী হিসাবে কী ভাবে চললে বা বললে তা আজকের যুগসম্মত হবে, সেটা আমরা ধরতে সক্ষম হব, আমরা মানুষকে ঠিক মতো পথ দেখাতে পারব এবং সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানটাকে আবার আমরা ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পারব। তাই আজ আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে শরৎচন্দ্রের চিন্তা, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে।

সাহিত্য বিচারের মাপকাঠি

কোনও সাহিত্যিকের সাহিত্য বিচার করবার পূর্বে, আমি সবসময়ই মনে করি, সাহিত্য বিচারের একটা বিজ্ঞানসম্মত মাপকাঠি আমাদের ঠিক করা দরকার। কী পদ্ধতিতে, কী দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থাৎ বিচারের কোন মাপকাঠিতে কোনও একজন সাহিত্যিকের বা তাঁর সাহিত্যকর্মের ওপর আলোচনা হবে— সেটা নির্ধারিত হলে শ্রোতাদের পক্ষেও বুঝতে সুবিধা হয় এবং বিচারটাও সঠিক হয় বলে আমার ধারণা।

এই কথাটা যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে প্রথমত আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যিকও সমাজের অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ। ফলে, যে সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একজন সাহিত্যিক বাস করেন, অর্থাৎ তাঁর যা সামাজিক পরিবেশ, তা অন্যান্য মানুষের মতোই তাঁর মানসিকতা এবং মননশীলতার ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাগুলোর সঙ্গে যারাই পরিচিত, তাদের মধ্যে এই ধারণাগুলো নিয়ে অন্যান্য মতপার্থক্য যাই থাকুক, সমাজ পরিবেশ যে মানুষের মননশীলতার ওপর এবং চিন্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে এবং সেই অর্থে একজন সাহিত্যিকের চিন্তার ওপরেও তা প্রভাব বিস্তার করে এবং কোনও সাহিত্যিকের পক্ষেই যে তার প্রভাবের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়, একথাটা নিশ্চয়ই সকলে মানবেন।

কোনও সাহিত্যিকের সাহিত্য বিচারের সময় এই কথাটি মনে না রাখলে অনেক সময় আমরা ভ্রান্ত বিচার করে বসি। অতীতের একটা সমাজ পরিবেশে যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, পরবর্তী সময়ে এসে আজ যে সমস্ত উন্নত চিন্তাভাবনা এবং জটিল ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণগুলোর দ্বারা আমরা প্রভাবিত হই, তার ভিতরে সেগুলো ঠিক তেমনভাবে না দেখতে পেলে বা তার সঙ্গে বর্তমানের বিরোধ উপস্থিত হলে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে স্থির করে বসি, যেহেতু আজকের প্রগতিশীল চিন্তার সঙ্গে তার বিরোধ রয়েছে, সেহেতু তা প্রগতিশীল নয় - তা প্রতিক্রিয়াশীল। আমি মনে করি এ বিচার ভ্রান্ত, দু'দিক থেকে ভ্রান্ত। প্রথম কথা হচ্ছে, এর দ্বারা সাহিত্যিকের চিন্তা বা তাঁর সাহিত্যকর্মগুলো আমরা স্থান-কালের ঊর্দ্ধে ধরে নিই এবং তার ভিত্তিতে সেগুলোর মূল্যায়ন করি। আমরা ধরে নিই যে, তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে শিল্পশৈলী, যে রস, যে রুচির মান এবং যে আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে সেগুলো শাশ্বত। সেগুলো চিরকালের জন্য কিছু নির্দেশ করছে অর্থাৎ সেগুলো কোনও একটা বিশেষ সময়ের বিশেষ সামাজিক মানসিকতার প্রতিফলন নয়, সেগুলোর মধ্য দিয়ে সর্বকালের চিন্তার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হচ্ছে। এ ধারণাকে আমি ভ্রান্ত মনে করি। আমি মনে করি, মানব সমাজে এমন কোনও জিনিস নেই যা স্থানকালের সীমার দ্বারা নির্দেশিত নয়, যা স্থানকালের ঊর্দ্ধে চিরন্তন এবং যা সর্বকালের জন্য একই রূপে সত্য। দ্বিতীয়ত, কোনও সাহিত্যের সত্যরূপ নির্ধারণ করতে হলে সমাজ বিকাশের এবং ইতিহাসের যে বিশেষ স্তরটিতে বিশেষ আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে এবং মানুষের মননশীলতার ও চিন্তা-ভাবনার যে বিশেষ অধ্যায়ে সেই সাহিত্যের অভ্যুত্থান, সেটি আমাদের লক্ষ রাখতে হবে। তারপর ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে আমাদের নির্ধারণ করতে হবে সেই সময়ে সমাজ অভ্যন্তরে কোন চিন্তা-ভাবনা সবচেয়ে উন্নত ছিল এবং তারই ভিত্তিতে মিলিয়ে দেখতে হবে, যে সাহিত্য আমরা বিচার করছি

সেই সাহিত্য সেই সময়ে কোন স্তরের বা কী ধরনের চিন্তা-ভাবনাকে প্রতিফলিত করেছে। এটা ঠিক করে ধরতে পারলে আমরা নির্ণয় করতে পারব ইতিহাসের সেই স্তরে সেই সাহিত্য মানব প্রগতিতে কী ধরনের স্থান অধিকার করেছিল এবং তারই ভিত্তিতে আমরা ধরতে পারব পরবর্তী অধ্যায়ে এসে যারা মানব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবে তারা তার মূল্য কীভাবে বুঝবে, কীভাবে গ্রহণ করবে এবং তার শিক্ষাকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সত্য সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা

জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি, তাতে আমি জানি সত্য সবসময়েই আপেক্ষিক এবং 'কংক্রিট'। অর্থাৎ সত্য বাস্তব সত্য, বিশেষ সত্য। সত্যের নির্বিশেষ কোনও সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অসম্ভব। এমনকি একটা বিশেষ সত্যের উপলব্ধিরও কোনও নির্বিশেষ সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় না — তারও ক্রমাগত পরিবর্তন এবং 'ডেভেলপমেন্ট' ঘটতে থাকে, সেও এক থাকে না। তাহলে সত্য মাত্রই শাশ্বত সত্য নয়, চিরন্তন সত্য নয়। এর থেকে আবার কেউ যদি মনে করেন, সত্য বলেই কিছু নেই, তাও কিন্তু ঠিক নয়। যেহেতু সত্য বিশেষ এবং আপেক্ষিক, সেই জন্যই সত্য 'ডিসিসিভ', সত্য অমোঘ। সত্য বাস্তব, ক্রিয়াশীল এবং তা ঘটনাকে প্রভাবিত করে। চিরন্তন সত্যের ধারণা যেহেতু অবাস্তব, সেহেতু তা অকার্যকরী। তা মানুষকে ভাববিলাসিতার মানসিকতা জোগায় মাত্র, বেশিরভাগ সময়েই তাকে বিপথগামী করে এবং কর্মক্ষেত্রে বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে অক্ষম করে তোলে। আপনারা দেখবেন, শিল্প-সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে এই যে আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে বলছি এবং প্রত্যেকেই যার যার মতটা সত্য বলে মনে করছি, এ জিনিস বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কখনও সম্ভব নয়। বিজ্ঞানে কোনও একটা তত্ত্ব সম্পর্কে বা তার তাৎপর্য সম্পর্কে ধারণা দেশকাল ভেদে আর মানুষ ভেদে কখনও আলাদা আলাদা হয় না। বিজ্ঞানে এ জিনিস সর্বত্রই এক। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকরা তাদের নিজ নিজ ঐতিহ্য অনুযায়ী 'ইলেকট্রিসিটি'র থিওরি আলাদা করেনি। এটা করা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। করলে ইলেকট্রিসিটিকে তারা ব্যবহার করতে পারত না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত জাপানি বৈজ্ঞানিকের জন্য যা, আমেরিকার বৈজ্ঞানিকের জন্যও তাই, জার্মানির বৈজ্ঞানিকের জন্যও তাই, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের জন্যও তাই। কারণ, এ পরীক্ষিত সত্য। সত্য বুঝতে আমাদের পার্থক্য হতে পারে। ফলে, বোঝার জন্য যদি আমরা যার যার ব্যক্তি উপলব্ধিকে এবং আমরা যে যেরকম বুঝি তাকেই সত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি করি, তাহলে সত্যে পৌঁছানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে সকলের পক্ষে গ্রহণীয় ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

সমাজের যে কোনও চিন্তা মেটেরিয়াল কন্ডিশনের দ্বারা সীমায়িত

যে কোনও সাহিত্য বা সেই সাহিত্যিকের চিন্তা-ভাবনা, যা তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে, আর সেই সাহিত্যের মধ্য দিয়ে শিল্পশৈলীর দিক, রসের দিক, ফর্মের দিক বা প্রকাশভঙ্গিমা-বচনভঙ্গিমার দিক যেটা ফুটে উঠেছে — এর যে কোনও জিনিস নিয়েই আমরা আলোচনা করতে বসি না কেন, আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার, অন্তত আমি নিজে এই কথাটা বিশ্বাস করি, তা হচ্ছে, যে কোনও সাহিত্যিকের চিন্তাভাবনা বা তাঁর সাহিত্য বিচার করতে গেলে যে সময়ে বা সমাজ প্রগতির ইতিহাসের যে বিশেষ স্তরে সেই সাহিত্যিকের অভ্যুত্থান বা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে — সেই স্তরটি, সেই সময়টি এবং সমাজ পরিবেশটি আমাদের মনে রাখতে হবে। স্থান-কাল নিরপেক্ষভাবে কোনও সাহিত্যিকের চিন্তা-ভাবনা বা জীবনদর্শনের আলোচনা বা মূল্যায়ন করতে গেলে আমরা ভুল করব। কারণ, মানুষের চিন্তা-ভাবনা এবং ভাবজগৎ স্থান-কাল-পরিবেশের সীমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মানুষের চিন্তা করবার যেমন অফুরন্ত শক্তি রয়েছে, অশেষ শক্তি রয়েছে, মানুষের ক্ষমতার যেমন সীমা-পরিসীমা নেই — তেমনি এই ‘সীমা পরিসীমা নেই’, ‘অশেষ ক্ষমতা’ এই জিনিসগুলোও বস্তুসীমা (মেটেরিয়াল কন্ডিশন) বা পরিবেশ, অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা সীমিত। কোনও মানুষের চিন্তার সীমা — তিনি যত বড় ক্ষমতাবান মানুষই হোন না কেন — তা ডিঙিয়ে যেতে পারে না।

এর দ্বারা আমি যে কথাটা বোঝাতে চাইছি তা হল, সমস্ত ধরনের চিন্তা-ভাবনা আসার আগে সমাজ অভ্যন্তরে মানুষের মননশীলতার বিকাশের উপযোগী ‘ইনগ্রেডিয়েন্ট’গুলোর বা উপাদানগুলোর সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ‘মেটেরিয়াল কন্ডিশন’টা আগে থেকেই তৈরি হয়। অত্যন্ত জরুরি এই কথাটা সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে বা মনীষীদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অনেক মানুষই মনে রাখেন না। আর মনে রাখেন না বলেই তাঁরা সব অদ্ভুত অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করেন। প্রত্যেক মানুষ, তিনি যত বড় মানুষই হোন না কেন, তাঁর চিন্তা এবং প্রতিভা যে মেটেরিয়াল কন্ডিশনের সীমার দ্বারা সীমিত, তাকে তাঁর পক্ষে অতিক্রম করে যাওয়া সম্ভব নয় — এই কথাটা বুঝতে পারলে তবেই আমরা স্থান-কাল-পরিবেশের মধ্যে মনীষীদের যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারব এবং যে মানুষটির ক্রিয়াকর্ম, ভাবনা-ধারণাকে আমরা বিচার করছি, সেই সময়ের সমাজ প্রগতির আন্দোলনের পরিপ্রক্ষিতে তার মধ্য দিয়ে ঠিক কী জাতের ভাবনা-চিন্তা, রসোপলব্ধি এবং সংস্কৃতির মান প্রতিফলিত হয়েছে, তা সমাজকে তখন এগোতে সাহায্য করেছে কি না, অর্থাৎ তা প্রগতিশীল কি না, আর প্রগতিশীল হলে তা কতটা প্রগতিশীল, অথবা যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে থাকে তবে তা কতটা প্রতিক্রিয়াশীল — এই প্রশ্নগুলোও আমরা বিচার করতে সক্ষম হব। তা না হলে

আমরা ধরে নিই যে, মানুষের মূল্যবোধ এবং চিন্তা-ভাবনার কতকগুলো মৌলিক দিক আছে, যা স্থানকালের ঊর্ধ্বে শাশ্বত, যা স্থানকালের সীমার দ্বারা, মেটেরিয়াল কন্ডিশন-এর সীমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এইরকম ধারণাকে আমি অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্ত ধারণা বলে মনে করি। এ শুধু ভ্রান্ত ধারণাই নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকারকও বটে। কারণ, এইরকম ধারণা চিন্তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে, সত্যকে বোঝার ক্ষেত্রে বিপত্তি সৃষ্টি করে। তা না হলে বলতে হবে, তাঁর নিজের যুগে বুদ্ধ অতবড় একজন চিন্তাশীল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর পক্ষে 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। অথবা, আজকের দিনে আমরা সাধারণ মানুষরা পর্যন্ত আধুনিক সভ্যজগতের গণতান্ত্রিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, মানবতাবাদ, নারী স্বাধীনতা বা নারীর মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্পর্কে যে চিন্তা-ভাবনাগুলোকে লালন-পালন করি, তদানীন্তন সময়ে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধের মতো মানুষের পক্ষে কিন্তু এইসব ধ্যান-ধারণার জন্ম দেওয়া সম্ভব হয়নি। বলতে হবে, বুদ্ধের বুদ্ধিশুদ্ধি আইনস্টাইনের থেকে কম ছিল বলেই তাঁর পক্ষে 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' বা 'ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফিল্ড' সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। বলতে হবে, ইউরোপের মানবতাবাদীরা, যাঁরা গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার উদগাতা, বা কার্ল মার্কস, যিনি অধিকতর উন্নত চিন্তার অর্থে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদ্‌গাতা, তাঁরা সব বুদ্ধ, শংকরাচার্য, মহম্মদ, যিশু, কনফুসিয়াস, সক্রেটিসের মতো মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি 'জিনিয়াস' বা প্রতিভাধর ছিলেন এবং তার জন্যই তাঁরা এগুলো করতে পেরেছেন। এই ধরনের চিন্তার সাথে আমি একেবারেই একমত নই। আমি মনে করি বিভিন্ন যুগের চিন্তানায়করা তাঁদের নিজের নিজের যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যুগের সীমা, স্থান-কাল-পরিবেশের সীমা অতিক্রম করতে পারেননি। একজন ব্যক্তির ক্ষমতা এবং প্রতিভা উচ্চমানের, সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরে থাকলেও সেই সময়ে ওই চিন্তা তাঁর মধ্যে আসা সম্ভব ছিল না। তাই আগের যুগে কোপার্নিকাস 'ন্যাচারাল সায়েন্স' সম্বন্ধে যে ধ্যান-ধারণা গড়ে তুলেছিলেন, সেই তত্ত্বের আধারের ওপরেই নিউটনের মতো বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটেছে। আবার 'নিউটনিয়ান মেকানিক্স'-এর জমি এবং বুনিয়াদ তৈরি হওয়ার পরেই আইনস্টাইনের মতো জিনিয়াস-এর বিকাশ সম্ভব হয়েছে।

সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যায়ন হয় না

তাই সাহিত্যেও চিরন্তন বা সর্বকালের জন্য কোনও চিন্তা-ভাবনা, রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক কাঠামো মানুষকে পথ দেখাতে পারে না। একটা বিশেষ স্তর বা বড়জোর

কতকগুলো স্তরকে ব্যাপ্ত করে একটা বিশেষ যুগের ভাবনা-ধারণা মানুষকে খানিকটা দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। তারপর নতুন পরিবেশে, নতুন সমস্যার সামনে পড়ে পুরনো সেই ভাবনা-ধারণা — যা একদিন সমাজের প্রগতি এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে, মানুষের উন্নতি, কল্যাণ ও বিকাশের ব্যাপারে সাহায্য করেছিল, সেই একই ধ্যান-ধারণা নতুন যুগের নতুন প্রয়োজনের মাপকাঠিতে, নতুন নতুন সমস্যার ওপর আলোকপাত করার পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো, অকার্যকরী, অসত্য, পিছিয়ে পড়া ভাবনা-চিন্তায় পর্যবসিত হয়ে যায়। ফলে, নতুন পরিবেশে মানুষের এবং সমাজের নতুন প্রয়োজনে অতীতের সর্বোচ্চ ভাবধারার 'কনটিনিউটি'তেই একটা সম্পূর্ণ নতুন আদর্শগত পরিমণ্ডল (ইডিওলজিক্যাল ক্যাটিগরি) আবার গড়ে ওঠে। যদিও অতীতের সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম ধ্যান-ধারণাগুলোর শক্ত ভিতের উপরেই এই সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারা গড়ে ওঠে, তাহলেও মনে রাখতে হবে, অতীতের সঙ্গে এই নতুন ভাবধারার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার মধ্যেও যেহেতু দুটো পরিমণ্ডল গুণগত দিক থেকে আলাদা সেইহেতু — তাদের মধ্যে একটা ছেদও (ব্রেক) থাকে। এইভাবেই মানুষের রুচি-সংস্কৃতিগত কাঠামো, চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত ধারণাগুলো অতীত যুগ থেকে বারবার নিত্যনতুনরূপে পরিবর্তিত হয়ে পাল্টে গিয়েছে।

কেউ কালজয়ী হতে পেরেছে বলে যে কথা বলা হয়, তার অর্থ কী? চিরকালের উপযোগী কোনও চিন্তা বা সাহিত্য বাস্তবে সম্ভব কি? অতীতের মহৎ ব্যক্তিরা কালজয়ী হন তো একটি অর্থেই। সেটা হচ্ছে, যদি কেউ তাঁর সমসাময়িক সময়ে মানবসভ্যতার বিকাশের ধারায় তখন যা বিপ্লবাত্মক এবং প্রগতিশীল চিন্তা, তার ভিত্তিতে জনগণের পক্ষ নিয়ে মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে থাকেন, তাহলে ইতিহাসে তার মূল্য চিরকালের। সমস্ত যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলিই কালজয়ী চিন্তা। কারণ, সমস্ত যুগের এই শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলি মালার মতো গেঁথেই সভ্যতার বিকাশ। এই একটা অর্থেই কোনও কিছু কালজয়ী হয়। এছাড়া কারুর একটা বিশেষ চিন্তা সর্বকালের চিন্তা হয় না। আবার অতীতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুলোর কোনওটাকেই অস্বীকার করে বা তাকে ঠিক মতো বুঝতে না পারলে মানুষের ইতিহাসটাই হারিয়ে যায়, মানুষের অগ্রগতির কোনও ধারাবাহিকতা থাকে না। যে চিন্তা বর্তমান গড়ে ওঠার জমি তৈরি করে দিয়েছে এবং বর্তমানকে গড়ার মাল-মশলাগুলো তৈরি করে দিয়ে গেছে, অতীতের সেই চিন্তা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কালজয়ী হয়ে থাকবে। এইভাবে যুগে যুগে অতীতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়করা কালজয়ী হয়েছেন। তাঁরা এই অর্থে কালজয়ী হননি যে, তাদের চিন্তাভাবনাগুলো বস্তুপরিবেশের সীমার দ্বারা সীমিত নয়, তা স্থানকাল নিরপেক্ষ

এবং চিরকালের জন্য শাশ্বত।

পূর্ববর্তী স্তরের চিন্তার সাথে পরবর্তী স্তরের চিন্তার ধারাবাহিকতা ও ছেদ থাকে

ফলে শরৎসাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা আজকের দিনে যেসব চিন্তা-ভাবনা বা আদর্শকে সবচেয়ে উন্নত বলে মনে করি, ঠিক সেই কথাগুলিই শরৎচন্দ্র তাঁর সময়ে বলেছেন কি না, আর যদি না বলে থাকেন, তবে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে গেলেন — এই ধরনের বিচার আসলে কোনও বিচারই নয়। এভাবে যাঁরা বিচার করেন, তাঁরা দেখতে পণ্ডিত হলেও, এ বিচার আকাট মূর্খের মতো। কারণ, তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সমসাময়িককালে সাহিত্যের মাধ্যমে যে জীবনদর্শন, চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতি ও রুচিগত মান প্রতিফলিত করেছিলেন, সেটা তদানীন্তন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজপ্রগতিতে সাহায্য করেছে কি না, বা তখনকার দিনে আমাদের দেশের প্রগতিশীল আন্দোলন এবং বিপ্লবী আন্দোলনের পরিপূরক ছিল কি না — শরৎসাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে এটাই হচ্ছে মূল বিচার্য বিষয়। আজকের দিনের বিপ্লবী আন্দোলন তদানীন্তনকালের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে, আদর্শের দিক থেকে এবং প্রকৃতিগত, সংগঠনগত দিক থেকে পাল্টে তো গিয়েছেই, এমনকি বিপ্লব করার মানুষগুলো পর্যন্ত পাল্টে গিয়েছে। ফলে, আজকের দিনের প্রগতি ও বিপ্লবের প্রয়োজনে যে চিন্তা-ভাবনাগুলো আমাদের কাছে সবচেয়ে অগ্রসর বলে মনে হচ্ছে, তার মাপকাঠিতে শরৎচন্দ্রের কোনও চিন্তা ততটা অগ্রসর মনে না হলেই তা প্রতিক্রিয়াশীল এবং ভ্রান্ত — একথা বলা চলে না। এভাবে কাউকেই মূল্যায়ন করা যায় না। এই কথাটা আমি আগেই বলেছি। নাহলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে সেক্সপিয়র, টলস্টয়, গ্যেটে, সক্রেটিস, বুদ্ধ কারোরই যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। আমরা শুধু আজ যেটাকে ঠিক বলে মনে করি, তার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত অতীতটাকেই ভ্রান্ত বলে ধরব। এর একটাই মানে দাঁড়াবে, তাহল আমরা ছিন্নমূল। এমনকি আমরা আজ যেটাকে ঠিক বলে মনে করছি, তারও যথার্থ মানে আমরা ধরতে পারব না। কারণ, আমাদের মনে রাখা দরকার যে, আমরা আকাশ থেকে পড়িনি এবং আমাদের আজকের সবচেয়ে উন্নত ভাবনা-ধারণাগুলোও হঠাৎ করে একদিন আকাশ থেকে পড়েনি। অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বর বা ব্রহ্মাও এগুলো তৈরি করে দিয়ে যাননি। সুদূর অতীতকাল থেকে মানব সমাজের সংগ্রামের এবং চিন্তা-ভাবনার অগ্রগতি ও বিকাশের ধারাতেই এগুলো এসেছে। ফলে, এগুলো আসার একটা ইতিহাস আছে এবং এর একটা 'কনটিনিউটি' বা ধারাবাহিকতা আছে — পুরো অতীত এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যদিও মনে রাখতে হবে, অতীত যেটা গড়ে দিয়ে

গিয়েছে, সেই আদর্শের এবং চিন্তা-ভাবনার কাঠামোর সাথে বর্তমানের আজ বিরোধ আছে। প্রত্যেকটি স্তরের চিন্তার সঙ্গে তার পরবর্তী স্তরের চিন্তা-ভাবনার এইরকম যেমন একটি ধারাবাহিকতার যোগসূত্র থাকে, তেমনি তার মধ্যে একটা ছেদও থাকে। একটা আর একটার থেকে আলাদা বলে তার বিরোধও থাকে। কিন্তু, অতীতের সঙ্গে কোনও কারণে এই যোগসূত্র হারিয়ে ফেললে যে কোনও সংস্কৃতিই ছিন্নমূল হয়ে পড়ে। তাই ভারতবর্ষে আজ যারা নয়া সংস্কৃতির কথা বলবে, যারা মানুষের কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থে বর্তমান সমাজব্যবস্থার একটা পরিবর্তন চাইবে এবং জীবনের নতুন সমস্যার সামনে পড়ে সংস্কৃতি-রুচি-নীতির ভিত্তিতে একটা নতুন শক্তিশালী সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলবে, তারা তখনই সেটা সার্থকভাবে গড়ে তুলতে পারবে যখন এর আগেকার স্তরের ভাবনা-চিন্তা এবং সংস্কৃতির সর্বোচ্চ স্তরটা তারা অনুধাবন করতে পারবে এবং তার ধারাবাহিকতায় এবং তার সাথে ছেদ ঘটিয়েই নতুন ভাবনা-চিন্তার কাঠামোটি আসবে, ফলে ‘কনসেপ্ট’ (ভাবনা-চিন্তা) দুটো আলাদা হবে।

বিচারের এই মাপকাঠিটা নির্ধারিত না হলে আমার বক্তব্য শোনার পর কেউ ইচ্ছা করলেই বলতে পারেন, এ মশাই আপনার মত, আপনি এরকম মনে করেন, আমি আবার অন্যরকম মনে করি। আমি এই ধরনের আলোচনার একেবারেই পক্ষপাতী নই। অর্থাৎ এই যে একই বিষয় সম্পর্কে এটা আমার মত, এটা আপনার মত, ওটা অমুকের মত, সেটা ওমুক সমালোচকের মত, ওটা ওমুক পণ্ডিতের মত — এইরকম নানা জনের নানা মত — এরকম ভাবলে সত্যটা বেরোবে কী করে? কারণ, একই বিষয় সম্পর্কে এই সমস্ত মতগুলোই যার যার মতো করে সত্য হতে পারে না। উনি পণ্ডিত, ফলে উনি যা বলছেন সেটা সত্য, আবার আমাকে যারা পণ্ডিত মনে করেন তাদের কাছে আমার কথা সত্য, আবার, আর একজনকে কেউ পণ্ডিত মনে করেন, তিনি অন্যরকম বলছেন, তাঁদের কাছে তাঁর কথাটাই সত্য — বিষয়টা কখনই এমন হতে পারে না। সত্য একটাই। হয় আমাদের মধ্যে কেউ একজন সত্য কথা বলছি, ঠিক ঠিক মূল্যায়ন করছি, আবার হয়তো এমনও হতে পারে যে, আমরা কেউই এখনও সত্যের সন্ধান পাইনি। সত্য আমাদের সকল মতগুলোর সংঘর্ষের পথ দিয়ে বেরিয়ে আসবে। একই বিষয় সম্পর্কে এরকম আমরা পাঁচজনে পাঁচরকম কথা বললে মানুষ কোনটা গ্রহণ করবে? এক্ষেত্রে কেউ হয়তো বলতে পারেন, যার যেমন বুদ্ধি তেমনভাবে যার কাছে যেটা সত্য বলে মনে হবে, সে সেটাই গ্রহণ করবে। এরকম যার যার বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে গেলে কী হবে? কোনও একটি বিষয় সম্পর্কে সঠিক ও সর্বসম্মত ধারণা গড়ে উঠবে না। তাই সত্যপথ নির্ধারণের জন্য ইতিহাসসম্মত, যুক্তিসম্মত এবং বিজ্ঞানসম্মত একটা সাধারণ মাপকাঠি আমাদের চাই, যেটা কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

সাহিত্যের ফর্ম হিসাবে কাব্য-উপন্যাসের সূচনা, বিকাশ ও শেষ আছে

যাঁরা সমাজপরিবেশ নিরপেক্ষভাবে সাহিত্য ক্ষমতার কথা বা কাব্য প্রতিভার কথা চিন্তা করেন, তাঁদের একটা সুবিধা আছে। তাঁরা মনে করেন, কাব্য প্রতিভা বা সাহিত্য ক্ষমতা একটা ঈশ্বর প্রেরিত দান। ফলে, এটা কখন আসবে, কখন আসবে না, কার মধ্য দিয়ে এই ক্ষমতা অঙ্কুরিত হতে পারে এ সম্পর্কে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে তাদের বিশ্বাসের একটা ভিত্তি আছে। কিন্তু, আমার যেখানে সে বিশ্বাসের ভিত নেই, সেখানে আমাকে একটা কথা ভাবতে হয়েছে। তা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের পর এ যুগে ভারতবর্ষে সাহিত্য সাধনার বন্যা বইছে, রাস্তায় রাস্তায় কবি গজিয়ে উঠছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা আমরা দেখতে পাই না কেন? যেমন, ইউরোপে রেনেসাঁসের পিরিয়ড পার হয়ে যাওয়ার পর শেলি, বায়রন, মিল্টন-এর মতো কাব্য প্রতিভা আর দেখা যাচ্ছে না। কাব্যের আর সেই রূপ নেই, কাব্যের সেই প্রতিভা নেই। কেন? ব্রহ্মতত্ত্বে যাঁরা বিশ্বাস করেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন এটা ঈশ্বরের মর্জি, তার একটা খেয়াল — সে খেয়াল আবার যতক্ষণ না হবে, কাব্যের মধ্য দিয়ে না বর্তাবে ততক্ষণ পর্যন্ত রবীন্দ্রপ্রতিভার মতো প্রতিভা কাব্যের ক্ষেত্রে দুনিয়ায় আর আমরা দেখতে পাব না, তাঁদের সেই মতটাই কি আমাদের মেনে নিতে হবে? না, তা নয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে আমি মনে করি, মানব ইতিহাসে কাব্যের শুরু আছে, কাব্যের অগ্রগতি এবং চরম বিকাশও আছে। আবার মানুষের চিন্তা রূপায়িত করার ক্ষেত্রেও কাব্য ফর্ম-এরও শেষ আছে। রবীন্দ্রনাথ হলেন কাব্য ফর্মের শেষ চূড়ান্ত শিরোমণি, অর্থাৎ ইতিহাসের গতিপথে যে যুগে এসে কাব্যের মধ্য দিয়ে মানবচিন্তা রূপায়িত করার যুগটি শেষ হল, রবীন্দ্রনাথ সেই যুগের শেষ সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তার পরবর্তী যুগে এসে কবিরা যত চেষ্টাই করুন, এমনকি তাঁর থেকে চিন্তায় অগ্রসর ব্যক্তিরা বা দরদিরা যাঁরা কাব্যের ছন্দও খানিকটা মেলাতে পারেন, তাঁরা হাজার চেষ্টা করলেও রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভা আর ফিরে পাবেন না, পেতে পারেন না। আর এটা পেতে পারি না বলে মানুষের সব শেষ হয়ে গেল এটা মনে করারও কোনও কারণ নেই। কারণ, মানুষের সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। মানুষ শুধু আহরণ করে জাগতিক সৌন্দর্যকে, আহরণ করে যে প্রাণশক্তি নিয়ে মানুষ নিত্যনতুন ভাবে বাঁচার চেষ্টা করছে তাকে। তাই মনে রাখবেন, অবিনশ্বর সাহিত্য সম্ভার বলে কোনও কিছু নেই।

উপন্যাস সাহিত্যের দিকে তাকালেও এই একই জিনিস দেখতে পাবেন। শরৎচন্দ্রের পর বা ডিকেন্স, টলস্টয় এবং ইউরোপের রেনেসাঁসের যুগে উপন্যাস সাহিত্যে আরও যাঁরা পুরোধা ছিলেন তাঁদের পর আর সেরকম উপন্যাস তৈরি হচ্ছে না। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের এক অধ্যাপক একবার আমাকে দুঃখ করে

বলেছিলেন, আজকালকার উপন্যাসে আর সেই দরদ পাওয়া যাচ্ছে না, তেমন উপন্যাস তৈরি হচ্ছে না। আমি বলি, দরদ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তার প্রকাশ অন্যত্র, অন্যরূপে তা প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্যের এই ফর্মের মধ্য দিয়ে দরদ আজ আর কাজ করতে পারে না। কারণ, ফর্মটাই খানিকটা ‘অবসলিট’ এবং ‘ব্যাকডেটেড’ হয়ে গেছে। সাহিত্যের এই ফর্মের মধ্যে একটা ছেদ এসে যাচ্ছে, এই ফর্মটা শেষ হয়ে আসছে। মানুষ আগে যাতে আনন্দ পেত, আজ আর তাতে আনন্দ পায় না। আবার আজ যাতে আনন্দ পাচ্ছে, ভবিষ্যৎ যে সমাজে এত ঝঞ্ঝাট থাকবে না, মানুষ খানিকটা নিশ্চিন্ত এবং উন্নত জীবন যাপন করবে, সেই সমাজে তার আনন্দ উপভোগ করার আজকের উপকরণগুলোও পাল্টে যাবে। অভাববোধ তখনও থাকবে, কিন্তু আজকের অভাববোধের রূপও পাল্টাবে। আজকের অভাববোধ এবং সেই সময়কার অভাববোধের কাঠামোর মধ্যে একটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে। তাই সাহিত্যের ফর্মও পাল্টাবে, কিন্তু সাহিত্য থাকবে। কারণ, সাহিত্য কী? মানুষ সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, পরিবেশ সম্বন্ধে একজন সাহিত্যিকের যে উপলব্ধি তাকে ভাষার মাধ্যমে নিজের চিন্তার জারক রসে সিক্ত করে প্রকাশ করার নামই সাহিত্য। এই সাহিত্য ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু, সে সাহিত্য উপন্যাস সাহিত্যের ফর্মেই চিরকাল থাকবে এবং চিরকাল শুধু ব্যক্তি প্রতিভার ওপর নির্ভর করেই উপন্যাস গড়ে উঠবে - এ অবাস্তব কথা। সাহিত্যের যে কাব্যরূপ অর্থাৎ কাব্যের মধ্য দিয়ে মানুষের ভাবনা-চিন্তাকে প্রকাশ করার যে ফর্ম, তা চিরকাল থাকবে — এ অবাস্তব বলে আমি মনে করি। বরং, আমি মনে করি, কাব্যের মধ্য দিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে প্রকাশ করার ফর্ম প্রায় শেষ হওয়ার পথে। তাই আজকে যাঁরা চেষ্টা করেও রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্য প্রতিভা অর্জন করতে পারছেন না বা তাঁদের ব্যর্থতায় যাঁরা মনে করছেন, প্রতিভারই শুধু অভাব — তাঁরা বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন না। এগুলো হচ্ছে আমার ধারণা। সৌন্দর্যতত্ত্ব মানুষের বুদ্ধিগত, ভাবগত ক্ষমতারই একটি দিক। তাই সৌন্দর্যের ধারণাও মানুষের পাল্টাচ্ছে। অতীত যুগের মানুষের সৌন্দর্যের উপলব্ধি যা, রেনেসাঁস যুগের মানুষের সৌন্দর্যের ধারণা তা নয়। মূল্যবোধ, সৌন্দর্যতত্ত্ব, দরদবোধেরও রূপ পাল্টাচ্ছে। একদিন যা মহাসুন্দর বলে মানুষের কাছে বিবেচিত হত, কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষ তাকে মহা কুৎসিত বলে বর্জন করেছে। তাহলে কে বলেছে সৌন্দর্যতত্ত্বের একটা শাশ্বত সত্তা আছে? কোনও একজন বড় মানুষ কথাটা বলেছেন বলেই কি তা মানতে হবে? এটা কি কোনও একটা যুক্তি হল?

সমাজে সাহিত্যিকের গুরুত্ব

এখানে একটা কথা আপনাদের বুঝতে হবে, তা হচ্ছে, সাহিত্যের ‘ফর্ম’ এবং

'কনটেন্ট' দু'টো আলাদা জিনিস। একটা হচ্ছে তার চিন্তা-ভাবনার বিষয়বস্তু। অর্থাৎ, সমসাময়িক সমাজ পরিবেশে প্রগতিশীল সর্বোচ্চ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে তা কতখানি প্রগতিশীল, অথবা প্রতিক্রিয়াশীল হলে কতখানি প্রতিক্রিয়াশীল— যেটা আমরা সাহিত্যের কনটেন্ট বলি। এ তো গেল সাহিত্যের চিন্তার দিক। অন্যদিকে ধরুন, কোনও সাহিত্যে চিন্তা-ভাবনা যা প্রকাশিত হয়েছে তা খুব উন্নত স্তরের চিন্তা। তাহলেই কি তাকে উন্নত সাহিত্য আমরা বলতে পারি? উন্নত স্তরের সাহিত্য হতে গেলে দেখতে হবে, তার সাহিত্যের শিল্পশৈলীও উন্নত স্তরের কি না। এটাও বুঝতে হবে, সমাজে একজন সাহিত্যিকের প্রয়োজনীয়তা বা কার্যকারিতা কী? তত্ত্বের বড় বড় কথাগুলো নিয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করা সাহিত্যিকের কাজ নয় — তিনি রসস্রষ্টা। এইখানেই সাহিত্যিকের যথার্থ সার্থকতা। উন্নত চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করার জন্য তো সমাজে চিন্তানায়করাই রয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মারফত মনস্তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানজগতের বিভিন্ন সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার জন্য সমাজে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত নানা ব্যক্তি রয়েছেন। তাহলে সাহিত্যিকের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

সাহিত্যের দরকার তো এখানেই যে, তত্ত্ব বিচারের মধ্য দিয়ে যে সত্যোপলব্ধি ও উন্নত ভাবনা-ধারণাগুলো গড়ে উঠেছে, গল্পের মাধ্যমে নানা ডালপালায় খেলিয়ে রসোত্তীর্ণ করে মানুষের মনের সূক্ষ্ম অনুভুতিগুলোর মধ্যে তার জায়গা করে দেওয়া — অর্থাৎ যারা তেমন শিক্ষার বুনিয়াদ এবং নিষ্ঠা না থাকার জন্য যুক্তি এবং বুদ্ধি দিয়ে বড় কথাগুলো গ্রহণ করতে পারে না — রসসৃষ্টির মাধ্যমে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে তাদের মনেও সেটা খানিকটা গেঁথে দেওয়া। গল্পের মাধ্যমে সাহিত্যিক যখন উচ্চমানের রস পাঠকের সামনে উপস্থাপনা করেন এবং কল্পনায় তারা যখন তাদের সামনে সেগুলিকে দেখে, তখন বাস্তব জীবনে সেগুলোর অনুপস্থিতি তাদের অস্থির করে তোলে। তারা ভাবতে থাকে, এগুলিকে আমরা চাই, কিন্তু এ জিনিস সমাজে নেই। এগুলি পেতে হলে এই সমাজকে আমাদের ভাঙতে হবে। সাহিত্য এই মানসিকতা পাঠকের মধ্যে গড়ে দেয়। এই কাজটি করার জন্যই তো সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা। শরৎচন্দ্র একজন মস্ত বড় সাহিত্যিক এইখানে। তাঁর সাহিত্যের পাতায় পাতায় লুকিয়ে রয়েছে তদানীন্তনকালের মানবতাবাদী সূক্ষ্ম মূল্যবোধগুলি, যেগুলো গল্পের মধ্য দিয়ে, রসের মধ্য দিয়ে মালার মতন গেঁথেছেন তিনি। অথচ, সেই মূল্যবোধগুলি উপস্থাপনায় একটিও কঠিন শব্দ কোথাও ব্যবহার করেননি, এতটুকু ব্যাখ্যা করে তাকে জটিল করে তোলেননি। এটা একটা সামান্য কথা নয়।

তত্ত্ব আলোচনা আমিও হয়তো কিছু কিছু করতে পারি। কিন্তু আমি কি একজন

সাহিত্যিক হতে পারি নাকি? আমি চিন্তার ক্ষেত্রে যতটুকু যা ভাবি, ততটুকু কি আমি সাহিত্যে রূপ দিতে পারি? আমি জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে এমন কথা কিছু কিছু বলতে পারি যা শুনলে হতবাক হতে হবে। কিন্তু আমিও সাহিত্যিকের দরবারে ধরনা দিই, ভিক্ষা মাগি। তা না হলে বড় কথা শোনার জন্য রবীন্দ্রনাথের দরজায়ও যাই না, গ্যেটের দরজায়ও যাওয়ার দরকার হয় না। আমি জানি আমার এ কথা শুনে হয়তো অনেকে রেগে যেতে পারেন। কিন্তু এ কথা সত্য যে, চিন্তার জন্য রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটের কাছে আমাদের যেতে হয় না। তাঁদের কাছে আমাদের যেতে হয় অন্য কারণে। লেনিন থেকে শুরু করে আমাকেও যেতে হয়। সকল দেশের সর্বকালের সমস্ত চিন্তানায়কদেরই যেতে হয়। এই কারণেই যেতে হয় যে, তাঁদেরও একটা অভাববোধ আছে। সেই অভাববোধ তাঁরা সাহিত্যের রসের মাধ্যমে পূরণ করেন। আর তাছাড়া সমাজের মধ্যে যে চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণাগুলোকে আমরা নিয়ে যেতে চাই, আমরা যা পারি না, সাহিত্যিক রসসৃষ্টির মাধ্যমে সেই চিন্তাভাবনাগুলোকে সমাজের মননের মধ্যে নিয়ে যান। এখানেই তিনি আমাদের চেয়ে বড় ক্ষমতার অধিকারী। সেইজন্যই আমরা তাঁদের পূজারি, আমরা তাঁদের শ্রদ্ধা করি। তাই সর্বকালেই দেখা গেছে, বড় সাহিত্যিকরা বড় চিন্তানায়কদের মানেন। আবার বড় চিন্তানায়করা বড় সাহিত্যিকদের কদর বোঝেন, শ্রদ্ধার আসনে রাখেন। ছোট সাহিত্যিকদেরই অহম বোধ আছে। তাই তাঁরা বড় চিন্তানায়কদের অস্বীকার করতে চান। কিন্তু কোনও দেশের বড় সাহিত্যিক সেযুগের বড় চিন্তানায়ককে অশ্রদ্ধা করেননি। কারণ তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন বোঝেন এবং বোঝেন কোথায় কার গুরুত্ব। তাই বড় বিপ্লবী লেনিন, গোর্কির দ্বারস্থ। লেনিন কি তত্ত্বের জন্য, চিন্তার খোরাক নেওয়ার জন্য গোর্কির চিন্তায় সমৃদ্ধিশালী হওয়ার জন্য গোর্কির কাছে হাত পেতেছেন? না। গোর্কি তো নিজেই লেনিনকে চিন্তানায়ক বলে মানতেন। তিনি তো লেনিনেরই বন্ধু, অনুগামী। অথচ, সেই গোর্কির কাছেই লেনিন ভিক্ষুকের মতো হাত পাতলেন। গোর্কিকে শ্রদ্ধা করতেন লেনিন। কীসের জন্য? কারণ, লেনিন জানতেন যে, রাজনৈতিক আন্দোলনে বক্তৃতার মধ্য দিয়ে, যেখানে সামনাসামনি কতকগুলো মানুষকে বোঝাবার সুযোগ পাওয়া যায় এবং শ্রোতারা বক্তার কাছ থেকে সরাসরি শোনার সুযোগ পায়, সেখানে হয়তো সহজ করে হোক, রস করে হোক মানুষকে তত্ত্বের কথা নানাভাবে খানিকটা বোঝানো যায়। কিন্তু, তত্ত্ব এবং আদর্শের ওপর যে বই লেখা হয়, সেই বইগুলো দিয়ে তত্ত্বের মূল কথাগুলো সবসময় লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধরানো যায় না, তাদের রুচি-সংস্কৃতির কাঠামো পালটে দেওয়া যায় না। এই অবস্থায় সমাজপ্রগতির আন্দোলনের পরিপূরক একটা মানসিক ধাঁচা— পুরো না বুঝলেও খানিকটা বোঝবার মতো অনুকূল মানসিক পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করে দিতে পারে

একমাত্র সাহিত্যিক— যে রাজনৈতিক নেতাদের মতো, তাত্ত্বিক বা পণ্ডিতদের মতো ভাষায় কথা বলে না, যে গল্প সৃষ্টি করে রসের দরজা দিয়ে মানুষের মধ্যে তত্ত্বের সেই কথাগুলো এমনভাবে পৌঁছে দেয়, যা বোঝার জন্য বেশি পাণ্ডিত্য বা লেখাপড়া জানার দরকার হয় না। গল্প পড়তে গিয়ে ব্যথায় মানুষের মন টনটন করে ওঠে, পড়তে পড়তে তার চোখ দিয়ে জল পড়ে, আর এই জল পড়ার মধ্য দিয়ে মানুষ খানিকটা বড় জিনিস গ্রহণ করে, সে পাল্টে যায়। এই যে ভালর দিকে মানুষের আকর্ষণ, সেটা কী অর্থে ভাল তা না বুঝেও যদি ঘটতে থাকে, মানুষ যদি ভালর প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে, ভালর ঘনিষ্ঠ হতে থাকে, ভালর সাথে আদানপ্রদান করতে থাকে, তাহলে মানুষ ভাল হয়ে যায়, মানুষ উন্নত হয়ে যায়, উঁচু হয়ে যায়। এই যে গল্প সৃষ্টি করে রসের মধ্য দিয়ে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে মানুষের রুচি-সংস্কৃতির সুরের মধ্য দিয়ে কাজ করবার অমোঘ ক্ষমতা সাহিত্যিকের রয়েছে— সমাজবিপ্লব এবং সমাজ অগ্রগতির প্রয়োজনে এইখানেই তার কার্যকারিতা। সমাজের মানসিক বিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব আনবার জন্য সাহিত্য অত্যন্ত কার্যকরী অস্ত্র। ফলে শিল্পশৈলী বা প্রকাশভঙ্গিমা সাহিত্যের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। রসের মাধ্যমে গল্প বলার মধ্য দিয়ে কত সহজে কত গভীরে একজন সাহিত্যিক মানুষের মনের মধ্যে ক্রিয়া করতে পারেন, তাঁর সাহিত্যের মধ্যে ব্যাখ্যা এবং বাক্যের বোঝা কত কম— এটার ওপর নির্ভর করে একজন সাহিত্যিকের শিল্পশৈলী কত উন্নত। তাই স্বাধীনতা আন্দোলন হোক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হোক বা সমাজের আমূল পরিবর্তনই হোক — যা রাজনৈতিক আন্দোলনের আবহাওয়ায় আসবে তার মানসিক জমি তৈরির ক্ষেত্রেই সাহিত্যিকদের দরকার। সেখানেই তাঁর প্রগতিশীল ভূমিকা। এই দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষে যখন রেনেসাঁস আন্দোলন এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে, সমাজবিপ্লবের আন্দোলন চলছে, তখন তার পরিপূরক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা, সকলের চেয়ে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছেন।

ইউরোপে প্রথম নবজাগরণ ও মানবতাবাদী চিন্তার জন্ম

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে বুঝতে হলে নবজাগরণ ও মানবতাবাদকে জানতে হবে। কারণ, শরৎচন্দ্র ভারতীয় নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলন যুগের সৃষ্টি। ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের প্রাক্কালে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ভিত্তিতে নবজাগরণের সূচনা ঘটেছিল, যাকে কেন্দ্র করে সেক্যুলার মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদী মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। যদিও পরবর্তীকালে খ্রিস্ট ধর্মের মূল সুরের সঙ্গে তারা আপস করেছে, তবুও ইউরোপের এই মানবতাবাদ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মীয় বিশ্বাসবিরোধী এবং যান্ত্রিক

বস্তুবাদ, অ্যাগনস্টিসিজম এবং ফুয়েরবাকের সেক্যুলার হিউম্যানিজম-এর দ্বারা মূলত প্রভাবান্বিত ছিল। ইতিহাসের ছাত্ররা স্বীকার করবেন কি না জানি না, কিন্তু ইউরোপ যে সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদের জন্ম দিয়েছিল, তার মূল কথা ছিল মানুষ। তা মানুষের মূল্যবোধের জয়গান গেয়েছে। এর আগে পর্যন্ত সামাজিক যে মূল্যবোধের ধারণা মানুষকে পরিচালিত করেছে, তার মূল কথা ছিল, ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষ, কাজেই ঈশ্বরের বিধান অর্থাৎ ধর্মীয় বিধানের দ্বারাই সমাজের সবকিছু চলবে। কিন্তু, মানবতাবাদ যে মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, তা মূলত সেক্যুলার বা অপার্থিব যে কোনও সত্ত্বার অস্বীকৃতি। তার মূল কথা হচ্ছে পার্থিব জগৎ ও মানুষই সত্য — মানুষ বা এই জগতের কোনও কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়। এই মানুষের স্বার্থে সমাজের কল্যাণ এবং প্রগতির সমস্ত কথা ভাবতে হবে। যা এভাবে ভাবে না, যা যুক্তিসঙ্গত নয়, যা বিচারগ্রাহ্য নয় এবং প্রমাণগ্রাহ্য নয় — তাকে বর্জন কর। সামাজিক সেইসব আইনকানুন, ন্যায়নীতি, মূল্যবোধগুলিই সঙ্গত, যা মানুষের উন্নতিতে এবং মানুষের সমাজের অগ্রগতিতে সাহায্য করে। এই মানবতাবাদী আদর্শ ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামন্ত যুগের বিরুদ্ধে শিল্পবিপ্লবকে কেন্দ্র করে ইউরোপে যে অভ্যুত্থান ঘটল তাকে আমরা রাজনীতির পরিভাষায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জাতীয় বিপ্লব বলি। ইউরোপের রেনেসাঁসের এই চিন্তা-ভাবনা ছিল মূলত বস্তুবাদী।

এই মানবতাবাদীদের মধ্যে যাঁরা ‘অ্যাগনস্টিক’, তাঁদের বক্তব্য ছিল, ঈশ্বর আছেন কি নেই, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কেন না, যে সেন্স অর্গানই মানুষের বিচারের একমাত্র উপায়, সেই সেন্স অর্গান দিয়ে ঈশ্বর আছেন কি নেই, এ সত্য নির্ধারণ করাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বরং যে জগতটাই অধিকতর বাস্তব, সেই জগতটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং যুক্তি দিয়ে বোঝো। আরেক দল ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন। তাঁরা ছিলেন বস্তুবাদী। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের গোড়ার দিকের ইতিহাস অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে, সেই আন্দোলনের রূপ তখন মূলত ছিল ‘সেক্যুলার’, বিপ্লবাত্মক এবং যৌবনোদ্দীপ্ত। এই রেনেসাঁস আন্দোলন ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে আপসহীন সুরকেই প্রতিফলিত করেছে। এই রেনেসাঁস আন্দোলনের উদ্‌গাতাদের বক্তব্য ছিল— ইতিহাস, যুক্তিবিজ্ঞান এবং প্রমাণের ভিত্তিতেই সত্যানুসন্ধান করতে হবে। তাতে যদি ভুলত্রুটি কিছু থাকে তো থাকুক, অজ্ঞেয় যদি কিছু থাকে তবে তাকে তুমিও জানতে পার না, আমিও জানতে পারি না। ফলে, তার পিছনে ছোটাছুটি করে কোনও লাভ নেই।

মানবিক চিন্তা মাত্রেই মানবতাবাদ নয়

এখানে একটা কথা আমি পরিষ্কার করে দিতে চাই। বহু মানুষ আছেন, যাঁরা

মনে করেন, মানবতাবাদী চিন্তা মানুষের মধ্যে আগাগোড়াই ছিল। তাঁদের ধারণা, মানুষের কল্যাণের জন্য যাঁরাই চিন্তা করেছেন — অর্থাৎ বুদ্ধের চিন্তাধারা, যিশুর চিন্তাধারা, মহম্মদের চিন্তাধারা, উপনিষদের ভাবনা-ধারণাগুলোর মধ্য দিয়ে মানুষের কল্যাণের যা কিছু চিন্তা করা হয়েছে — এঁদের সকলেরই চিন্তাধারায় মানবতাবাদী চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। এভাবে যাঁরা মনে করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। মানুষের কল্যাণের জন্য যেহেতু এঁরা সকলেই চিন্তা করেছেন, সেজন্য সেগুলোকে আমরা মানবিক চিন্তা বলতে পারি। মানুষের কল্যাণের জন্য চিন্তা মানেই মানবতাবাদ নয়। মানবতাবাদ বলতে একটা বিশেষ আদর্শগত, রুচিগত, নীতিগত, এথিক্যাল একটা ক্যাটিগরি, বিচারবিবেচনার এবং ধ্যান ধারণার একটা পুরো নতুন মাপকাঠি বোঝায় যাকে একটা বিশেষ পরিমণ্ডল বা সীমা বলতে পারেন। মানবতাবাদের এই বিশেষ ক্যাটিগরির সঙ্গে পূর্বের সমস্ত মানবকল্যাণের ধারণার একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। পূর্বের মানবকল্যাণের ধারণাগুলো বিশেষ যুগের বিশেষ সমাজ জীবনের প্রয়োজন থেকেই গড়ে উঠলেও তা ধর্মীয়, শাশ্বত মূল্যবোধ এবং শাশ্বত সত্যের ধারণা। অর্থাৎ বাস্তবে যে সত্য প্রতিদিন জন্ম নিচ্ছে এবং মরছে, প্রতিদিন যে নতুন নতুন সত্যের জন্ম হচ্ছে, তাকে অস্বীকার করে একটা সত্য যা একটা সময়ে গড়ে উঠল, তাকেই শাশ্বত সত্য রূপে ধরে সবসময়ে সমস্ত অবস্থাতেই সমস্ত বিশেষ সত্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ বলতে এরকমই শাশ্বত মূল্যবোধের ধারণা বোঝায়। বাস্তবে, সমাজের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে, অর্থাৎ চলমান গতির মধ্য থেকে যে প্রয়োজন প্রতিভাত হয়, তাকে কেন্দ্র করেই মূল্যবোধগুলো গড়ে ওঠে। এর আসার ইতিহাস আছে, এর যাওয়ার ইতিহাস আছে। এ বিশেষ সত্য, সর্বসময়ে বিশেষ রূপে প্রতিভাত। এক একটা পরিমণ্ডলের মধ্যে সব বিশেষগুলোকে সমন্বয়ের মাধ্যমে যে একটা সাধারণ সত্যের ধারণা হয়, যা সমস্ত সমাজ জীবনকে, সমস্ত 'ওয়াকস অফ লাইফ'কে গাইড করে, সেই সাধারণ সত্যের ধারণাও কিন্তু ওই বিশেষ পরিমণ্ডলের সীমার দ্বারা সীমায়িত। আপনাদের মনে রাখা প্রয়োজন সমাজের মধ্যে প্রচলিত একটা আদর্শবাদ, ন্যায়নীতির একটা কাঠামো — অর্থাৎ ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণাগুলো একটা বিশেষ সমাজের বিশেষ অগ্রগতির প্রয়োজন থেকে উদ্ভুত একটা বিশেষ ধারণা। সেই সময়টা অতিক্রান্ত হলে, সেই প্রয়োজনটা পার করে দিলে সম্পূর্ণ নতুন একটা সমাজব্যবস্থার পরিবেশের সামনে নতুন উৎপাদিকা শক্তি এবং নতুন দ্বন্দ্ব ও সমস্যার ভিত্তিতে যখন নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সমাজে নতুন আদর্শবাদেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই সময় পুরনো আদর্শবাদ, পুরনো ভালমন্দের যে বিশেষ ধারণা একদিন সমাজ প্রগতিতে সাহায্য করেছে, সমাজকে এগিয়ে দিয়েছে, সমাজের সংহতি ও ঐক্যকে রক্ষা করেছে এবং

অন্যায় থেকে মানুষকে বাঁচিয়েছে, তাকেই কেউ ধরে থাকলে সে খোদ নিজেই অন্যায় করতে থাকবে। সে বুঝতে পারবে না, কী করে সে অন্যায় করছে, শুধু র‍্যাশানালাইজ করবে অবস্থার দোহাই দিয়ে। আর মনে রাখবেন, এই ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা ক্রমাগত পাল্টাচ্ছে। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় সবসময় আছে। তাই নৈতিকতাও সবসময় আছে। একধরনের কিছু লোক আছেন যারা মনে করেন, আধুনিক জীবনযাত্রা, বিজ্ঞান ও বস্তুতান্ত্রিক চিন্তা অনুযায়ী ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা — এগুলি হচ্ছে সব বুর্জোয়া কুসংস্কার বা সামন্ততান্ত্রিক ধর্মীয় কুসংস্কার। এইসমস্ত লোকেরা বিজ্ঞানের দোহাই দেন, মার্কসবাদের কথা বলেন। আমি নিজে মার্কসবাদী হয়েও কোনওদিন তাদের সঙ্গে একমত ছিলাম না, আজও নই। আরেক দল 'প্রায়রি ভ্যালু' অর্থাৎ পূর্বস্থিরীকৃত সত্ত্বার অস্তিত্ব থেকে উদ্ভুত যে মূল্যবোধগুলোকে দর্শনে প্রায়রি ভ্যালু বলা হয়, সেই মূল্যবোধের মধ্যে ন্যায়নীতি, ভালমন্দ, আদর্শবাদের যে শাশ্বত ও স্থবির কতকগুলো ধারণা আছে, সেইগুলোকেই 'মর‍্যালিটি' মনে করেন। সমস্ত সমাজের যথার্থ ও সত্যিকারের প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে মর‍্যালিটি বা আদর্শবাদের ধারণা ক্রমাগত পাল্টায়। কিন্তু মর‍্যালিটি ও ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা সবসময়ই আছে এবং থাকবে, কেবল তার কনটেন্ট ও ফর্ম পাল্টাবে। তাই, মূল্যবোধের ধারণার একটা বিশেষ ক্যাটিগরি, যেটা এই সীমাকে অতিক্রম করতে গেলেই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে এবং তার ফলে মানুষের কল্যাণ সাধনের সদিচ্ছা সত্ত্বেও আসলে অকল্যাণই সাধন করে বলে নতুন মুল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তা নাহলে শিল্পবিপ্লবকে কেন্দ্র করে সেক্যুলার মানবতাবাদের জন্ম হত না। এই সেক্যুলার মানবতাবাদ ইউরোপে গোড়ায় ছিল ধর্মের সাথে আপসহীন, ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে তা আপস করেনি। ধর্মের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল— ওটা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। 'সেক্যুলার' রাষ্ট্রে ধর্মে বিশ্বাসী এবং যে ধর্মে বিশ্বাস করে না উভয়েরই একই অধিকার থাকবে। কিন্তু, রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ন্যায়নীতি, বিজ্ঞানসাধনা এগুলোর ওপর ধর্ম চাপাতে গেলে তা বাধার সৃষ্টি করে। ফলে, এগুলোকে ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ফলে সেক্যুলার মানবতাবাদের ভিত্তিতে যে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তা ধর্মকে বাধা দেবে না, প্রশ্রয়ও দেবে না। ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ ধর্মে বিশ্বাস করে, সে ধর্মীয় আচরণ করতে পারে। কিন্তু, ধর্ম বিশ্বাস করানোর জন্য কাউকে জোর করা চলবে না। প্রথমে মানবতাবাদী আন্দোলনটা ইউরোপে গড়ে উঠেছিল এই ধারণার ভিত্তিতেই। তাদের জাতীয় চরিত্রের মানসিকতা, বলিষ্ঠতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের গুণাবলিগুলো, নারী স্বাধীনতা সম্বন্ধে ধারণাগুলো, মূল্যবোধের ধারণাগুলো গড়ে উঠেছিল প্রবল সেক্যুলার আন্দোলনের ভিত্তিতেই। সেক্যুলার মানবতাবাদের এই ধারণাটা কিন্তু ইউরোপের বুর্জোয়ারা সমাজজীবনে, রাষ্ট্রনীতিতে

বেশিদূর পর্যন্ত রক্ষা করতে পারল না। কিছুদূর এগোবার পরই পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে তারা ধীরে ধীরে 'ক্রিশ্চিয়ানিটি'র মূল সুরের সঙ্গে এই সেক্যুলার হিউম্যানিজমের একটা আপস করল। যদিও একথা তারা আজও বলে না এবং সেজন্য তাদের সংবিধানে এখনও তার প্রতিফলন রয়েছে। তাদের সংবিধানে এখনও রয়েছে যে, ধর্মে বিশ্বাসী এবং যে ধর্মে বিশ্বাস করে না, রাষ্ট্রে উভয়েরই সমান অধিকার থাকবে।

ভারতীয় নবজাগরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য

এখানে বলা দরকার, রাজা রামমোহন রায় থেকেই এদেশের রেনেসাঁস আন্দোলনের শুরু। ইউরোপের বুর্জোয়া মানবতাবাদী ধ্যানধারণা ও চিন্তা-ভাবনাগুলিকে ধর্মের মূল সুরটির সঙ্গে মিলিয়ে ধর্মীয় সংস্কারের পথেই তিনি এদেশে রেনেসাঁস আন্দোলনের জন্ম দেন। ফলে এদেশের রেনেসাঁস আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কারের (রিলিজিয়াস রিফর্মেশন) পথ ধরে ধীরে ধীরে এগোতে থাকে। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অভ্যুত্থান রেনেসাঁস আন্দোলনে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা এবং যতদূর মনে হয় বিদ্যাসাগর মশাই-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ধর্মীয় সংস্কারের পথে রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্যে একটা ছেদ (ব্রেক) ঘটালেন। তিনিই প্রথম এদেশে যতদূর সম্ভব মানবতাবাদী আন্দোলনকে ধর্ম থেকে মুক্ত করে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও যুক্তির শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে চাইলেন। দেখুন, বিদ্যাসাগরকে এদেশের মানুষ বড় মানুষ বলে জানে, তাঁকে শ্রদ্ধা করে, পূজা করে। কিন্তু তাঁকে বুঝেছে কয়জন? আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাইরের আবরণটা দেখে, অর্থাৎ তাঁর হাঁটুর উপর কাপড় পরা এবং মাথায় টিকি রাখা দেখেই তাঁকে একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ভাবেন। একথা ঠিক, বাইরের দিক থেকে তাঁর শাস্ত্রকারের মতো এবং নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণের মতো বেশই ছিল, কারণ, এ দেশটাকে তিনি বুঝতেন। কিন্তু, ভিতরে তিনি ছিলেন তদানীন্তন ভারতীয় সমাজ পরিবেশে একজন খাঁটি হিউম্যানিস্ট। তিনি ভারতীয় সভ্যতার সাথে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতার একটা যুক্তিভিত্তিক সংযোগ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর বক্তব্য ছিল, ছাত্রদের ইংরেজি শেখাও, মিলের (জে এস মিল) লজিক পড়াও। তিনি বলেছিলেন, সংস্কৃত শিখিয়ে কুব্জ হয়ে যাওয়া এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করা যাবে না। এই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া করতে হলে বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে তাকে পরিচিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। আর ইংরেজি শিখলে দেশের যুবকরা তার মাধ্যমে ইতিহাস, লজিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সাথে পরিচিত হবে, ইউরোপের বস্তুবাদী দর্শনের সাথে পরিচিত হবে। এই বিষয়টি নিয়ে তৎকালীন বেনারস ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল

ব্যালেনটাইন সাহেবের সঙ্গেও তাঁর বিতর্ক হয়। ব্যালেনটাইন সাহেব ছাত্রদের সংস্কৃত এবং ভারতীয় ট্র্যাডিশনের দু'টি বড় দর্শন সাংখ্য ও বেদান্ত পড়াবার সাথে সাথে ইউরোপের বার্কলে-র ভাববাদী দর্শন 'এনকোয়ারি' পড়াবার পক্ষপাতী ছিলেন। দেখুন, বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন এই সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শনের একেবারে 'অথরিটি'। তিনি কিন্তু এই দুটোরই বিরোধিতা করে বললেন, আমাদের দেশের সাংখ্য এবং বেদান্ত যেমন ভ্রান্ত দর্শন, তেমনি ইউরোপের বার্কলে-র দর্শনের মধ্য দিয়েও ওই একই ভ্রান্ত ধারণা প্রতিফলিত। এ দিয়ে মানুষ আজ আর পথ পাবে না, সত্য জানতে পারবে না। বাধ্য হয়ে এই দু'টি দর্শন এদেশে পড়াতে হচ্ছে। বার্কলে-র দর্শনও একইরকম ভাববাদী। তাই ইউরোপের এমন দর্শন পড়াতে হবে, যাতে এদেশের ছাত্ররা বুঝতে পারবে সাংখ্য, বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন। সত্য জানতে গেলে দেশের যুবকদের এবং মানুষের মনকে যুক্তিগ্রাহ্য করে গড়ে তুলতে হবে। তাই তিনি বলেছিলেন, ছাত্রদের মিলের লজিক পড়াতে হবে এবং তা সংক্ষিপ্ত কোর্স নয়, পুরো কোর্স পড়াতে হবে। আর বলেছিলেন, আমাদের ইংরেজী শিখতে হবে এবং তার দ্বারা ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে এবং বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে। তবেই দেশের মানুষ বস্তুজগতকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে সত্যোপলব্ধি করতে এবং তার ওপরে মানুষের নতুন জীবনবোধ বা মুল্যবোধ খাড়া করতে সক্ষম হবে। এই কারণেই তিনি ওই সমস্ত অসার অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী দর্শন ছাত্রদের পড়াবার ক্ষেত্রে বিরুদ্ধতা করেছিলেন। এই হলেন বিদ্যাসাগর মশাই। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে অতি সহজেই ধরা পড়বে যে, ধর্মীয় সংস্কারের পথে আমাদের দেশে রামমোহন রায়ের সময় থেকে যে রেনেসাঁস আন্দোলন শুরু হল — বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন সেই ধারার মধ্যে একটি বলিষ্ঠ ছেদ, যিনি মানবতাবাদী আন্দোলনকে তদানীন্তন পরিবেশে যতদূর সম্ভব ধর্মীয় বিচারবুদ্ধি ও প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ সত্য তাঁর জীবনের সমস্ত কার্যকলাপ, আচার-আচরণ, কথাবার্তার মধ্য দিয়েই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ভূমিকা বাদ দিলে আমাদের দেশের রেনেসাঁস আন্দোলন পুনরায় ধর্মীয় সংস্কারের পথ ধরেই এগোতে থাকল। একদিকে হিন্দু সমাজকে সংস্কার করে তাকে দোষত্রুটি মুক্ত করার জন্য ব্রাহ্মধর্মের প্রবল জোয়ার সৃষ্টি হল। অপরদিকে তারই প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের তুমুল আন্দোলন শুরু হল। হিন্দুধর্মীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে ওই সময়েই পুনরায় হিন্দুসমাজকে জাতপাত ও কলুষতা থেকে মুক্ত করার জন্য হিন্দু ধর্মসংস্কারকরা এলেন এবং এই ধারাবাহিকতাতেই রামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তারপর বিবেকানন্দে এলে তা আবার একটা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। বিবেকানন্দ এই হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। বেদান্তকে পুনর্জীবিত করার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ

ভারতের জাতীয়তাবাদের সাথে বেদান্তের ভাবধারা মেশালেন এবং তার মধ্য দিয়ে জাতীয় গৌরব সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন। তিনি রেনেসাঁস আন্দোলনকে শুধু রিলিজিয়াস রিফর্মেশনের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না। তিনি উপাসনা এবং সাধনার পরিবর্তে কর্মযোগের ওপর জোর দিলেন এবং হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবতাবাদী ভাবনা ধারণাগুলো মিলিয়ে এই আন্দোলনকে একটা স্তর এগিয়ে দিলেন। বিবেকানন্দ নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনে না থাকা সত্ত্বেও সারা দেশে এক প্রবল জাত্যভিমান ও দেশাত্মবোধের জন্ম দিলেন, যে জাত্যভিমান এবং দেশাত্মবোধকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করল। কিন্তু, তিনি এই যে জাত্যভিমান ও দেশাত্মবোধের জন্ম দিলেন, তা দিলেন বেদান্ত দর্শন ও ভারতীয় অতীত স্পিরিচুয়াল প্রাইড-এর ভিত্তিতে। অনেকটা এই কারণেই, অর্থাৎ বিবেকানন্দের এই ধারাটির সাথে ছেদ না ঘটাতে পারার ফলেই পরবর্তীকালে যে দেশজোড়া তীব্র স্বাধীনতা আন্দোলন এদেশে গড়ে উঠল, যা বুর্জোয়াশ্রেণি নিজস্বার্থে কাজে লাগিয়েছে, তা মূলত হিন্দু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ থেকে গিয়েছে।

ভারতে জাতীয়তাবাদের জন্ম, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আপসমুখী জরাগ্রস্ত মানবতাবাদ

এটা জানা দরকার যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে বিভিন্ন উপ-জাতিগুলির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে যে নতুন জাতীয়তাবোধের ধারণা গড়ে উঠেছিল, সেটা ভারতবর্ষে পূর্বে ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতবর্ষ বিভিন্ন রাজা ও নবাব বাদশাহদের অধীনে বিভক্ত ছিল। এরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছে এবং তখন লড়াই করাটাই ছিল একপক্ষের কাছে অন্য রাজ্য দখলের লড়াই এবং অন্যপক্ষের কাছে স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। কিন্তু আধুনিক জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধ বলতে গোটা ভারতবর্ষের যে একটা সম্মিলিত দেশাত্মবোধ আজ আমরা বুঝি — এটা গড়ে উঠেছে ব্রিটিশ শাসনের অধীনেই। ব্রিটিশরা একটা কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রেললাইন প্রভৃতির মাধ্যমে সমস্ত উপ-জাতীয় অর্থনীতিগুলি, স্থানীয় গ্রামভিত্তিক অর্থনীতিগুলি ভেঙে পরস্পর সংমিশ্রণের পথে গোটা দেশের একটা ট্রেড অ্যান্ড কমার্স সিস্টেম গড়ে তুলতে থাকল। এটা যেমন যেমন গড়ে উঠতে থাকল, তেমন তেমন সমস্ত উপ-জাতিগুলির মধ্যে একটা সমস্বার্থবোধ গড়ে উঠতে থাকল, যে সমস্বার্থবোধ বিভিন্ন উপ-জাতিগুলির মধ্যে গড়ে ওঠার পথেই গোটা ভারতবর্ষের নতুন জাতীয় চেতনার সৃষ্টি।

আমাদের দেশে জাতীয় পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে অত্যন্ত অদ্ভুত প্রক্রিয়ায়,

সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপসের প্রক্রিয়ায়। ভারতবর্ষে যে সময়টায় স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হল, সেই সময়ে ইউরোপের পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পরিণত হয়ে মানবতাবাদকে পদদলিত করে নগ্ন ফ্যাসিবাদী একনায়কত্বের দিকে পা বাড়াচ্ছে। ইউরোপের পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদী রূপ পরিগ্রহ করল, যখন শিল্পে সংকট সৃষ্টি করল, উৎপাদনের সংকট সৃষ্টি করল, 'লিবার্টি' থেকে মুখ ফিরিয়ে 'ব্যুরোক্রেসি' এবং সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল, যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি করল, তখন ইউরোপের মানবতাবাদ আবার মুখ ফেরাল ধর্মের দিকে, ধর্মীয় রিভাইভ্যালিজমের দিকে। তা সেইসময় পলায়নমুখী হয়েছে এবং 'সিনিসিজম'-এর জন্ম দিয়েছে। যেমন বার্নার্ড শ'র মতো প্রভাবশালী ব্যক্তি 'সিনিক' হয়েছেন। আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের এই প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থায় ভারতবর্ষে পুঁজিবাদ এল এবং পুঁজিবাদকে কেন্দ্র করে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটল। এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব এই জাতীয় বুর্জোয়াদের হাতে থাকার ফলে সেই মানবতাবাদী আন্দোলনের মধ্যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আমরা দেখলাম, ইউরোপের সেই জরাগ্রস্ত মানবতাবাদের ধারাটাই প্রধান এবং মূল ধারা হয়ে এল, যেটা ধর্মের সঙ্গে , অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে আপসমুখী এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলোর সঙ্গে মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলোকে মেলাতে চাইছে। আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনে যিনি প্রধান নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন, হিন্দু 'প্রফেট' এর রূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে এবং বেশিরভাগ যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের অধিকাংশের জীবনযাত্রা, কথা বলা সবকিছু তাঁরই আদর্শ অনুযায়ী ছিল। অথচ, এই দেশটা শুধু হিন্দুর নয়, এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস। সেখানে ধর্মকে ভিত্তি করে সব মানুষের আস্থা অর্জন করতে হলে সব ধর্মের প্রফেট হওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু, জামাকাপড়ে কেউ একসঙ্গে সব ধর্মের ফকির হতে গেলে তাকে বুজরুক হতে হয়। ফলে মুসলিমরা তাঁকে দূর থেকে শ্রদ্ধা করলেও তো সন্দেহ করবে। তাদের মনের সন্দেহ যাবে কোত্থেকে? সেখানে দুটো-চারটে-পাঁচটা মুসলিম মানুষকে বুঝিয়ে আনা যেতে পারে, তারাই এসেছে। কিন্তু, বিরাট মুসলিম জনসাধারণকে স্পর্শ করা যায়নি। তারা কি সব প্রতিক্রিয়াশীল ছিল নাকি? তারা শোষিত ছিল না? তাদের মনের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল না? মুসলিমরা স্বাধীনতার জন্য প্যালেস্টাইনে যেখানে তারা আরও পিছিয়ে পড়া, সেখানে লড়ছে না? চিনের মুসলিমরা, বর্মার মুসলিমরা, ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমরা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার লড়াই দেখিয়ে দিল না? তুরস্কের কামাল পাশার দেশের মুসলিমরা ভারতবর্ষের আগে গণতন্ত্রের জন্য লড়েনি? তারা পর্দা ছুঁড়ে ফেলে দেয়নি? ধর্মকে তারা সংস্কার করেনি? এই সেদিন বাংলাদেশের মুসলিমরা

সেখানকার হিন্দুদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়ে লড়েনি? তাহলে মুসলিমরা লড়তে জানে না, মুসলিমরা প্রতিক্রিয়াশীল এ সমস্ত কথার অর্থ কী? আসল কথা হচ্ছে, এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন হিন্দু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বলে মুসলিমদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আমি নিজে দেখেছি, মুসলিমদের বলা হয়েছে, হ্যাঁ ভাই, আমরা সব কমরেড, আমরা গণতন্ত্র চাই, স্বাধীনতার জন্য আমরা একত্রে লড়ব, কিন্তু আমার ঘরে তুমি ঢুকতে পারবে না, আমার অন্দরমহলে ঢুকতে পারবে না। বাড়িতে খুব খাতির করে তোমার জন্য আলাদা থালা রাখব, না হয় বাইরে থেকে চিনামাটির গ্লাস নিয়ে আসব, বাইরের ঘরে তোমাকে খেতে দেব। তথাকথিত লোয়ার কাস্টদের ক্ষেত্রে, ট্রাইবসদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবহার করা হল। এইসব আচরণ করলে ঐক্য গড়ে উঠবে কোত্থেকে? বিশ্বাস আসবে কোত্থেকে? এইসব কি বক্তৃতা করে হয় নাকি? যার যার আচার নিয়ে আমরা সব আলাদাই রইলাম, তাহলে মিলবে কোত্থেকে? মিলতে হলে ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার করে দিতে হবে। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাদীক্ষা থেকে শুরু করে বিবাহ, সামাজিক রীতিনীতি সবকিছুকে ধর্ম থেকে মুক্ত করতে হবে। সেক্যুলারিজম বলতে তাই বোঝায়। অথচ, এদেশে তার চর্চা হল না। বামপন্থীরাও তা করল না।

এই কারণেই সমাজকে পুরনো ভাবনা-ধারণা, জাত-পাত, ধর্মীয় কুসংস্কার, ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য — এই সমস্ত সামন্তী মানসিকতার কূপমণ্ডুকতা থেকে আমরা মুক্ত করতে পারলাম না। আমরা বিভিন্ন উপ-জাতির (ন্যাশানালিটি), বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধগুলি মেলাতে পারলাম না। রাজনৈতিকভাবে আমরা সকলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য লড়ছি — এই ধারণায় আমরা এক হলাম, কিন্তু, সামাজিক ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা শুধু বিহারি-বাঙালি, হিন্দু-মুসলমান থেকে গেলাম তাই নয়, হিন্দুর মধ্যেও আবার আমরা বর্ণ হিন্দু, সিডিউলড কাস্ট, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় ইত্যাদি থেকে গেলাম। ফলে, আমাদের জীবনযাত্রায় গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধগুলি এল না। বরং দেখা গেল, ক্ষমতায় আসার পর একদিকে কায়েমী স্বার্থবাদীরা, সম্পত্তির মালিকরা যারা অপরকে দমন করে রেখেছে, তারা শোষণের জন্য যেমন কমিউনিটি ও জাতপাতের মনোভাবকে ব্যবহার করতে থাকল, অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতারাও এই জাতপাতের মনোভাবকে ব্যবহার করতে থাকলেন, এবং তা ব্যবহার করেই নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে চাইলেন। ফলে, তাঁরা এর বিরুদ্ধে লড়বেন কী করে?

ধর্মীয় পুরনো মূল্যবোধ নিঃশেষিত

তাই একটা জিনিস আপনারা দেখবেন, পুরনো দিনের লোকেরা নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারবেন যে, একদিন যে বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই আদর্শের কনটিনিউয়িটিতে এদেশে স্বাধীনতার লড়াই শুরু হল, সেই স্বদেশি আন্দোলনের যুগে বাংলাদেশের যুবকরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে, সমাজপতিদের বিরুদ্ধে তথাকথিত অচ্ছুৎ সহ সমস্ত লোকদের নিয়ে সার্বজনীন পূজার আন্দোলন শুরু করল। কারণ, স্বাধীনতা আন্দোলনটা জরাগ্রস্ত মানবতাবাদী ধারণার সীমার মধ্যেও যতটুকু সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে স্বাধীনতা অর্জন, গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং সীমাবদ্ধভাবে হলেও পুঁজিবাদের রাস্তাটাকে আমাদের দেশে খানিকটা খুলে দিতে চেয়েছে, ততটুকু অর্থে ভারতবর্ষের প্রগতির স্বার্থে তা পরিপূরক ছিল। তাকে তখন বিজ্ঞানের কথা, নতুন মূল্যবোধের কথা কিছু কিছু বলতে হয়েছে। কিন্তু, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একদিকে রাষ্ট্রনায়করা এবং তাদের রাজনৈতিক দল কংগ্রেস, অন্যদিকে তথাকথিত কমিউনিস্টরা, র‍্যাডিক্যালিস্টরা সবাই নির্বাচনে ভোট পাওয়ার জন্য পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে পুজো কমিটির উদ্যোক্তা হয়ে বসল এবং পূজায় উৎসাহ দিতে থাকল। ফলে, সর্বজনীন পুজোর হিড়িক বেড়ে যাচ্ছে, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, পুরানো অভ্যাস — এগুলো বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। মানুষ পুরনোটাকে ছাড়তে পারছে না, অথচ সেই পুরনো মূল্যবোধের শক্তির কোনও অস্তিত্ব নেই। পুরনো মূল্যবোধ আমাদের মধ্যে আর কাজ করছে না। ধর্মের উপদেশ দিলে আজ লোকে পাগল মনে করে, কেউই মানে না। পুজো যারা করে, তারা ধর্ম মানে না। পুজোর হিড়িক লাগায় যারা, তাদের যন্ত্রণায় মানুষ চব্বিশ ঘণ্টা বিরক্ত। অনেকেই অনুভব করেন এগুলোর দ্বারা ধর্মকর্ম কিছুই হচ্ছে না, এর পিছনে অন্য ব্যাপার আছে। এর মানে কী? পুজোর সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজ করছে না। ধর্ম-কর্ম কিছু কাজ করছে না। একমাত্র রায়টের সময় মানুষের ধর্মবিশ্বাস বোঝা যায়। আর মানুষের ধর্মবিশ্বাস বোঝা যায় মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময়। এগুলো শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও খুব প্রবল। তারা মাঠে গণতন্ত্র সম্পর্কে বক্তৃতা দেন, তারপরেই ঘরে এসে চিন্তা করেন, তিনি বোস পরিবার, তার মেয়ে তথাকথিত নিচু বর্ণে বিয়ে করবে, এ জিনিস কী করে তিনি বরদাস্ত করবেন? তার পক্ষে এ জিনিস বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। ছেলেটি যে মানুষ হিসাবে 'বোস' এর থেকে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে — এ জিনিস তার দেখার উপায় নেই। আর বোস যে বোসমশাই হয়ে মানুষ হিসাবে নিচুতেই রয়ে গিয়েছে, তার থেকে এক ইঞ্চিও এগোয়নি, এও তার দেখার দরকার নেই। তিনি মেয়েদের স্বাধীনতা, এথিক্স, মূল্যবোধ এসবই তত্ত্বে আলোচনা করেন, কলেজেও পড়ান। দরকার মতন তার ওপর চার-পাঁচটা বই ঘেঁটে এর থেকে কিছু তার থেকে কিছু

নিয়ে বা সেগুলো পড়ে বা সেই কথাগুলোই নিজের ভাষায় বড় একটা বই লিখে বিক্রি করে কিছু পয়সাও কামিয়ে নেন। সেই বই-এর ভিতর নারী স্বাধীনতা, মূল্যবোধ সম্পর্কে অনেক বড় বড় ভাল কথাও থাকে, কিন্তু বাড়িতে তিনি আচরণ করেন এইরকম। এই জিনিসটা ভাবতে গেলে অন্য সব প্রশ্ন ছেড়ে যে জায়গাটায় আসতে হবে তা হচ্ছে, পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধ, যা আমাদের মধ্যে এতদিন কাজ করেছে এবং তারপরে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে দেশাত্মবোধকে কেন্দ্র করে মানবতাবাদী নতুন মূল্যবোধ, মানুষের কল্যাণবোধ, সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধ, অর্থাৎ বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ — ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গেই যা একটু মিলেমিশে ছিল — এই দুটোর প্রভাব সমাজের মধ্যে ছিল। আজ এই দুটো আদর্শবাদই একটা ইউটোপিয়া হয়ে গেছে। কারণ, বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় যাওয়ার পর, বুর্জোয়াশ্রেণি প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী হওয়ার পর, তার সমস্ত আদর্শই একটা সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। মানুষ দেখছে, বুর্জোয়ারা আদর্শবাদ প্রচার করছে শুধু লুটবার জন্য, মানুষকে সর্বস্বান্ত করার জন্য। তার নিজের জীবনে আদর্শবাদের সেই 'ক্রিড' নেই, সেই নীতিগুলি নেই। কারণ মানবসভ্যতার বিকাশের একটা যুগে এসে যখন বুর্জোয়া মানবতাবাদ, পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল হল, তখন তার আর প্রগতির ভূমিকাই নেই। পুরনো ধর্মীয় মূল্যবোধ আগেই ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। যদিও গ্রামীণ জীবনে তার অবশিষ্ট আজও খানিকটা আছে, কিন্তু তার সেই আগের জোর নেই। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাবু সমাজের মধ্যে যাকে আমরা শহুরে সমাজ বলি, সেখানে ধর্মের অনুষ্ঠান বেড়েছে, কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজ করছে না। এখানে অনুষ্ঠানের ডামাডোল বেড়েছে, অনুষ্ঠানে সব মাতোয়ারা, কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ কাজ করে না, মানবতাবাদী মূল্যবোধও কাজ করে না। অথচ নতুন যে মূল্যবোধ আজকের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রগতির পরিপূরক, সেই আদর্শবাদ ও মূল্যবোধও সমাজে প্রভাব বিস্তার করেনি। ফলে আদর্শবাদ, নৈতিকতা, ন্যায়নীতির ক্ষেত্রে একটা বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছে।

আদর্শবাদের ক্ষেত্রে এই শূন্যতা পূরণ করার জন্য যেমন সামাজিক আন্দোলন প্রয়োজন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রয়োজন, আবার এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেটা গড়ে উঠবে, তার ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি একটা প্রধান ও শক্তিশালী হাতিয়ার। শুধু যুবশক্তিকে গালি দিয়ে কী লাভ? যৌবনের শক্তি যে প্রচণ্ড বন্যার বেগের মতো আসে — এ তো সবাই মানে। তাকে ঠিকপথে চালনা করার জন্যই তো নীতিনৈতিকতা, রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলনের প্রয়োজন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে নতুন একটা নীতিনৈতিকতার ধারণার প্রভাব সমাজের ওপর বিস্তার করেই তো তাকে আমরা সঠিক পথে চালনা করতে পারি। এটাই তো যুগে যুগে সব দেশে

করা হয়েছে। আমি এই কথাটা বলতে চাইছি যে, আজ দেশে শুধু অর্থনৈতিক সংকটই নয়, রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক যা কিছু সংকট দেখছি, ধর্ম-বর্ণ-উপজাতিগত অনৈক্য, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা দেখছি, যুব সমাজের মধ্যে রুচিহীনতা, বিপথগামিতা ইত্যাদি দেখছি, এইসব কিছুর কারণ হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির স্বার্থে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আপসমুখিতা, জরাগ্রস্ত মানবতাবাদের প্রভাব।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র — ভারতবর্ষে মানবতাবাদের দুইটি ধারা

আবার এরই বিপরীতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের গোড়ার দিকে যে বিপ্লবী সুরটি আমরা দেখতে পেয়েছি, এদেশে শরৎচন্দ্রের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদী ভাবধারার সেই বিপ্লবী সুরটিই বার বার আসতে চেয়েছে। ফলে, ভারতবর্ষে মানবতাবাদী আন্দোলনের দু'টো ধারাই এসে গেল— একটা আপসমুখী জরাগ্রস্ত মানবতাবাদ, যে ধর্মের সঙ্গে, ভাববাদের সঙ্গে আপস করে চলছে, যেটা স্বদেশি আন্দোলনের সময় বিদেশি ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়ে এদেশে এসে গেল। আর এসে গেল আপসহীন, বিপ্লবাত্মক, সেক্যুলার মানবতাবাদ— ইউরোপের রেনেসাঁসের গোড়ার দিকে যেটা ছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে দু'জন এই দু'টো ধারাকে এদেশে প্রতিনিধিত্ব করেছেন— একজন রবীন্দ্রনাথ, আর একজন শরৎচন্দ্র। একজন উপনিষদের ছাত্র, আর একজন বস্তুবাদ ও অ্যাগনস্টিসিজম-এর ছাত্র। তাই একজন শাশ্বত সত্য এবং চিরন্তন সৌন্দর্যের কথা বলছেন, আর একজন বলছেন, সত্য বিশেষ সত্য, শাশ্বত নয় — মানুষের বিশেষ প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে তার নিত্য নতুন অভ্যুদয়, চিরন্তন সৌন্দর্য বলে কিছু নেই। ঠিক যেমন রাজনৈতিক আপসমুখী সংস্কারবাদী ছিলেন গান্ধিজি, ঠিক বিপরীতে ছিলেন আপসহীন বিপ্লবী ধারার মূর্ত প্রতীক নেতাজি। একজন বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়ার প্রতিনিধি, অন্যজন পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের প্রতিনিধি। বাংলার বিপ্লববাদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নাড়ির যোগ ছিল। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার এই পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ইউরোপের রেনেসাঁসের সেই অতীত যুগের বিপ্লববাদেরই ধারা— যাদের মডেল ছিলেন ডি ভ্যালেরা এবং কণ্ঠে ছিল রুশো-ভলটেয়ার।

এদেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনতা আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করল, ঠিক সেই সময়েই বাংলার সমাজে সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের অভ্যুত্থান। রিফর্মেশনের পথে রেনেসাঁস আন্দোলনের মধ্যে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ভূমিকা যেমন মানবতাবাদী আন্দোলনকে তদানীন্তন সমাজ পরিবেশে যতদূর সম্ভব ধর্মীয় প্রভাব ও ধর্মীয় যুক্তিবিচার থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে একটা ব্রেক (ছেদ), তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু রিলিজিয়ন ওরিয়েন্টেড

ন্যাশানালিজম এবং ধর্মের সঙ্গে আপসমুখী জরাগ্রস্ত মানবতাবাদী চিন্তা-ভাবনা থেকে শরৎচন্দ্রও একটা ব্রেক।

আর, মানবতাবাদের জরাগ্রস্ত আপসমুখী ধারাটি এদেশে প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয় বুর্জোয়ার বিপ্লব বিরোধী আপসমুখীনতার মধ্যে, যা গান্ধিবাদের মধ্য দিয়ে ধর্মের সঙ্গে মিলেছে, পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলেছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যেও আপনারা তাই পাবেন। মানবতাবাদের সমস্ত সূক্ষ্ম মূল্যবোধগুলি নিয়েই তিনি কারবার করতে চেয়েছেন তাঁর ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে। গান্ধিজির মতোই তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে ছিলেন মূলত আপসমুখী, যদিও তিনি গান্ধিজির মতো গোঁড়া ও রক্ষণশীল ছিলেন না, অনেকটা লিবারাল ছিলেন। নানা চরিত্রচিত্রণের মধ্য দিয়ে শরৎসাহিত্যে মানবতাবাদের সূক্ষ্ম মূল্যবোধগুলি যত প্রাঞ্জল হয়েছে এবং তদানীন্তন সময়ে সমাজজীবনে পরিবর্তন আনবার ক্ষেত্রে যত ডেডলি হয়েছে, বাংলার সমাজকে তা যতটা উদ্বুদ্ধ করেছে, ততটা কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য করতে পারেনি— একমাত্র কিছু কবিতা, সঙ্গীত ও ছোটগল্প ছাড়া। আমার একথার দ্বারা যদি কেউ মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথ সমাজবিপ্লবের ঝান্ডাটি উচ্চে তুলে ধরেননি বা সমাজের কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে তিনি চাবুক চালাননি, তাহলে ভুল হবে। বরং সমাজের কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে, জাতপাতের বিরুদ্ধে অনেক চাবুক তিনি চালিয়েছেন, আমি তা জানি। একথা ঠিক, সমস্ত মানবতাবাদী চিন্তার একটা পরিপূর্ণ রূপ আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যে পাই। অর্থাৎ মানবতাবাদী চিন্তাভাবনার ব্যাপ্তি তাঁর মধ্যেই সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত। একথাও ঠিক, মানবতাবাদী যুগের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এত ব্যাপ্তি নিয়ে মানবতাবাদী চিন্তার বিভিন্ন দিকের প্রকাশ অন্য কোনও সাহিত্যিকের মধ্যে ঘটেনি। এমনকি জীবনের শেষপ্রান্তে কঠিন নির্মম বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে তিনি পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে 'তীর্থস্থান' বলে অভিনন্দনও জানিয়েছিলেন।

অনেকদিন আগে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ইংরেজির একজন অধ্যাপক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবতাবাদী যে মূল্যবোধগুলো নিয়ে সেক্সপিয়রের শুরু, সেই মূল্যবোধগুলো নিয়ে রবীন্দ্রনাথও সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু, আমি বুঝতে পারি না, স্বাধীনতা বা ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্যায়ন নিয়ে সেক্সপিয়রের মধ্যে যে 'ভিগার' পাই, যে 'ডেসপারেটনেস' পাই, যে বলিষ্ঠতা পাই, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তা পাই না কেন? অথচ, বড়ত্বের অর্থে, চিন্তার ব্যাপকতার অর্থে, সৌন্দর্যের রূপায়ণের অর্থে রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর থেকে ছোট নন। কোনও দিক থেকে তাঁকে ছোট মনে করা যায় না। তবু মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেন সেই ভিগার নেই, যেটা সেক্সপিয়রের মধ্যে ছিল। আমি তাকে বলেছিলাম,

শরৎচন্দ্রে ফিরে আসুন। আপনারা বিদগ্ধরা শুধু রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র মিলে পড়লে ভারতবর্ষে মানবতাবাদী ভাবধারার দুটো দিক আপনাদের চোখে পড়বে। আর, শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়ে শুধু রবীন্দ্রনাথ পড়লে আপনি যে কথা বলছেন সেই কথাই বারবার মনে হবে। যদি সৎ হন, যদি রবীন্দ্র চাটুকারে পরিণত না হন, তাহলে এ জিনিস মনে হবেই। রবীন্দ্রনাথ ওপরতলার লোক ছিলেন যা তিনি ঐকতান কবিতায় নিজেই বলেছেন। ব্যক্তি জীবনটাও যেমন তাঁর ওপরতলার, চিন্তা-ভাবনাও তাঁর ওপরতলা থেকে এসেছে — তা ছিল 'সাবজেকটিভ', ভাববাদী, ধর্মভিত্তিক। আর, শরৎচন্দ্র ছিলেন মাটির সাথে যুক্ত। এ দেশের সাধারণ মানুষের ভাবনা, জীবনের নানা সমস্যা, তাদের ব্যথা-বেদনা প্রতিদিন তাঁকে স্পর্শ করেছে, তিনি ছিলেন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলত বস্তুবাদী। তাই এদেশের নবজাগরণের যৌবনটা শরৎচন্দ্রের মধ্যে, বার্ধক্যটা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রতিফলিত। আর এই দুটো নিয়েই অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র মিলিয়েই এ দেশের পুরো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবধারা বা মানবতাবাদের কাঠামোটা আমাদের ধরতে হবে।

তাই তৎকালীন যুগের পরিপ্রেক্ষিতে শরৎসাহিত্য কোন স্তরে পড়ে, তা বিচার করতে হলে বুঝতে হবে, সেই যুগে আমাদের সমাজের মধ্যে যা যা চিন্তা ছিল, যা যা আন্দোলন ছিল, যা যা মানসিকতা ছিল তার মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল, সবচেয়ে অগ্রগামী, সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক চিন্তা কোনটা ছিল এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে, যে বিচারধারাটা তুলনামূলক বিচারে তখনকার সময়ে সবচেয়ে প্রগতিশীল ছিল, শরৎসাহিত্যের মধ্য দিয়ে কি তা প্রতিফলিত হয়েছে, না হয়নি। আর যদি দেখা যায়, শরৎসাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের সেই যুগের সবচেয়ে উন্নত, সবচেয়ে প্রগতিশীল চিন্তাই প্রতিফলিত হয়েছে, তাহলে শরৎসাহিত্যই ছিল আমাদের দেশে সে যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য, শরৎচিন্তাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা, শরৎসাহিত্যের প্রগতিশীলতাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীলতা। যাঁরা বলছেন, শরৎচন্দ্র সে যুগে সবচেয়ে প্রগতিশীল, বিপ্লবী, সবচেয়ে অগ্রগামী সাহিত্যিক ছিলেন না, বা তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতিগত, রুচিগত সবচেয়ে উচ্চ মূল্যবোধ এবং তত্ত্বগত সবচেয়ে উচ্চ ধারণা প্রতিফলিত হয়নি — তাঁদের এই কথাটা প্রমাণ করতে হবে যে, উন্নত চিন্তা-ভাবনা সেই সময়ে শরৎচন্দ্র প্রতিফলিত করেননি, করেছেন অন্য কোনও সাহিত্যিক এবং শরৎচন্দ্রের চেয়ে উন্নতভাবে করেছেন। এটা যদি তাঁরা প্রমাণ না করতে পারেন, তাহলে শরৎচন্দ্রই যে সে যুগে সবচেয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যিক ছিলেন, একথা তাঁদের মানতে হবে।

শরৎসাহিত্যে দেশাত্মবোধ— আন্তর্জাতিকতাবাদ ও ন্যারো ন্যাশানালিজম

আগেই বলেছি, যে সময়ে শরৎচন্দ্রের এদেশে আবির্ভাব, সেই সময়ে

এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশাত্মবোধের ধারণা গড়ে উঠেছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের অগ্রগতির প্রশ্নটি নিহিত। তার মধ্য দিয়েই এদেশে মানবতাবাদী ভাবধারার বিকাশ, মানুষের মননশীলতা, উন্নত চরিত্রের বিকাশ, ব্যক্তির বিকাশ সমস্ত কিছু ঘটছে, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবাহে আবর্তিত হয়ে তা ঘটছে। স্বভাবতই সেই সময়ের প্রগতিশীল আন্দোলনের পরিপূরক এই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই বলিষ্ঠরূপে শরৎ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর এই জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে একদল সংকীর্ণ (সেক্টারিয়ান) দৃষ্টিভঙ্গি বলে মনে করেন। তাঁদের মতে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি মানে তা আন্তর্জাতিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নয় — তা একটা সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি, বিদগ্ধদের ভাষায় 'ন্যারো' দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, এই ন্যারোর মধ্যেই তখন বৃহতের প্রশ্নটি জড়িত। এই ন্যারোকে বাদ দিয়ে বৃহৎটা গড়ে উঠতে পারে না। তাঁদের যথার্থ উপলব্ধি থাকলে তাঁরা বুঝতে পারতেন যে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বা আন্তর্জাতিকতাবাদের মানসিকতার মূল উপাদানগুলো সেই সময়ে এদেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের আকাঙ্খা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে।

সত্যিকারের দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনই তো বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বা আন্তর্জাতিকতাবাদের পাদপীঠ। দেশাত্মবোধকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতাবাদ কখনই গড়ে উঠতে পারে না। তাই যথার্থ শ্রমিক আন্তর্জাতিকতাবাদে উদ্বুদ্ধ কোনও মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে যদি এদেশে দেখতেন, তাহলে দেখতেন যে, সে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সে একজন বলিষ্ঠ যোদ্ধা এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী সমাজবিপ্লবের সে একজন একনিষ্ঠ সংগ্রামী। স্বাধীনতা আন্দোলন যখন চলছে, তখন সেটা বাদ দিয়ে বসে বসে সে বিশ্ববিপ্লবের বক্তৃতা করত না। কারণ সে জানে, এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথেই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ও শ্রমিক আন্তর্জাতিকতাবাদের পথ তৈরি হচ্ছে। সে জানে, এইভাবে প্রতি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিজয় অর্জন এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তার আকাঙ্খিত যে বিশ্ব বিপ্লব, তা সংগঠিত হবে। কাজেই একে ন্যারো মনে করলে ভুল হবে। সেই সময়ে যারা এই জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মানসিকতাকে ন্যারো বলে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের কথা বলেছে, তারা আসলে বিশ্বভ্রাতৃত্বের নামে বুর্জোয়াদের যে ধারণা, যা সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক অর্থাৎ যাকে আমরা বুর্জোয়া 'কসমোপলিটানিজম' বলি, যা দেশের মুক্তি আন্দোলনগুলোকে মেরুদণ্ডহীন করে ফেলে, বিভ্রান্ত করে ফেলে — তার পৃষ্ঠপোষক। স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই সময়ে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ইংরেজের অকথ্য অত্যাচারের মোকাবিলা করেছে, তখন এরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের এইসব বড় বড়

কথা বলে সেই স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে পালিয়েছে। আজ ভিয়েতনামে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য যারা দেশের ভিতর থেকেই সমস্ত রসদ সংগ্রহ করছে এবং দেশের মানসিকতাকে একমুখী করে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে সমূলে উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে ভিয়েতনামকে মুক্ত করতে চাইছে, বিশ্বভ্রাতৃত্বের মনোভাবনা তারা সবচেয়ে উদারভাবে, সবচেয়ে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করছে। নাকি, যারা এই সংগ্রামটাকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে অথবা, 'আমেরিকাতেও ভাল মানুষ আছে', বা 'এটা সাময়িক সংগ্রাম, এর চেয়েও বড় ধারণা 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব' প্রভৃতি নানা যুক্তি তুলে সংগ্রামটাকেই মেরে দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের জয়গান গাইছে এবং আমেরিকার সঙ্গে ঐক্যের কথা বলছে, তারা ওই মরণপণ সংগ্রামের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বকে এবং বিশ্বমানবতার মুক্তির লড়াইকে এবং তার মূল্যবোধকে বেশি এগোতে সাহায্য করছে? এ না বুঝলে বিচার সঠিক হতে পারে না। এটা ন্যারো তো নয়ই, বরং এখান থেকেই সত্যিকারের শ্রমিক আন্তর্জাতিকতাবাদের বা সত্যিকারের বিশ্বভ্রাতৃত্বের রক্ত, রস, মাটি অর্থাৎ তার উপাদানগুলো সংগ্রহ হচ্ছে। বিশ্বমানবতার মুক্তির আকাঙ্খা তো বিশেষীকৃতভাবে রূপ নিচ্ছে দেশে দেশে এই সমস্ত জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলনগুলোর মধ্যে, সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের আন্দোলনগুলোর মধ্যে। এইগুলোকেই তো এক যোগসূত্রে গেঁথে তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যত মানবসমাজের মিলনের মহাক্ষেত্র। একে অস্বীকার করে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের কোনও জমি তৈরি হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র কী বলছেন, সেটা বিচার করুন। তিনি বলছেন, "দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াস 'ন্যারো ন্যাশানালিজম' নয়, 'চাউভিনিজম'ও নয়, বিশ্বমানবের হিত সাধনের জন্যই নিজের দেশ। আদর্শের উল্লেখ যখন করব, তখনই বৃহৎ আদর্শ, গৌরবের আদর্শের কথাই স্মরণ করব। কেবল মহামানবের আদর্শ গ্রহণ করব, তাকে ভারতের আদর্শ, এশিয়ার আদর্শ, হিন্দুর আদর্শ এদিক দিয়ে কিছুতেই বিচার করব না। কারণ সেই তো ক্ষুদ্র মনের সংকীর্ণ হীন আদর্শ, কোনও মতেই সর্বজনীন মুক্ত আদর্শ নয়।" এরপর মার্কসবাদী না হয়েও আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে 'শেষ প্রশ্ন'-তে ঘোষণা করলেন, "বিশেষ কোনও একটা দেশে জন্মেছি বলে তারই নিজস্ব আচার আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে। এতই কী মমতা! বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা, একই ভাব একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায় কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই তো ভয়? নাই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানবজাতির একজন বলে পরিচয় দিতে তো কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম!" ইউরোপের প্রথমযুগের রেনেসাঁস ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগেও কোনও সেক্যুলার মানবতাবাদীর কণ্ঠে এরকম কথা শোনা যায়নি। এতো প্রায় সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা। বোঝা

যায় শরৎচন্দ্রর ওপর মার্কসবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কতটা প্রভাব পড়েছিল! কাজেই শরৎ সাহিত্যের বিচার করতে গিয়ে যাঁরা বলেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের জয়গান তিনি গেয়েছেন, কিন্তু বিশ্বভ্রাতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর ছিল না — তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা নোট বই লেখার লোক, তাঁদের উচিতই নয় এসব আলোচনার মধ্যে ঢোকা। এই নোট বই লেখা পণ্ডিতরাই সব আজকাল সাহিত্য আলোচনার বেশির ভাগ আসর দখল করে আছেন এবং তার ফলেই সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সংস্কৃতির একটা মূল কথা তো হল এই যে, যার ভিতরে সংস্কৃতি আলোড়ন জাগিয়েছে, তার জীবনটাই পালটে যায়। অথচ, এখানে দেখা যাচ্ছে, যাঁরা বড় বড় সংস্কৃতির কথা বলছেন, তাঁদের জীবনে তার কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। সংস্কৃতির কথাটা তাদের শুধু বক্তৃতায়, লেখায় এবং সমালোচনা করার সময়, আর জীবনের ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে একটা 'ক্রুড ভালগার মেটেরিয়ালিস্ট'-এর মতো শুধু নিজেরটা গুছিয়ে নেওয়া। কোনও কিছু ছাড়বার ক্ষমতা তাঁদের নেই, জীবনে কোনও ঝুঁকি তাঁরা নিতে পারেন না। এইরকম বেশিরভাগ মানুষই আজকাল সমাজে বুদ্ধিজীবী পরিচয় নিয়ে চলছেন, তাঁরাই আজকাল সব সমালোচক, সমাজের সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। তাঁরাই শরৎচন্দ্রের মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ছিল না — এইসব কথা বলে সব গোলমাল করে দিচ্ছে। যিনি যে কোনও মতেরই সমর্থক হোন না কেন, সত্যিকারের সংস্কৃতিবোধ মানুষের মধ্যে অপরের মতামত যুক্তি দিয়ে শোনার এবং বিচার করার যে উদারতা এবং সহনশীলতা এনে দেয়, তার অভাব তাঁদের মধ্যে ভয়ানকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এদেশে তথাকথিত কমিউনিস্টরা শরৎসাহিত্যের মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছে

সকলেই স্বীকার করবেন যে, সমস্ত যুগে স্তরে স্তরে যে উন্নত চরিত্র, উন্নত চিন্তার সৃষ্টি হয়েছে, তারই ধারায় বুর্জোয়া বিপ্লববাদী চিন্তাধারা পার করে দিয়ে, তার থেকেও উন্নত স্তরের চিন্তাধারা অর্থে সর্বহারা বিপ্লববাদের চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়েছে। এই উন্নত স্তরের চিন্তাধারা বলতে আমরা কী বুঝি? না, উন্নত স্তরের চিন্তাধারা হচ্ছে তাই, যা উন্নত ধরনের মানুষ সৃষ্টি করে। তাহলে বুর্জোয়া বিপ্লব যে মানুষগুলো, যে উন্নত চরিত্রগুলো সৃষ্টি করেছে, সেই পুরনো দিনের হিউম্যানিস্ট বিপ্লবী অর্থাৎ বুর্জোয়া বিপ্লববাদের সেইসব সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলোর চেয়েও সর্বহারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে মানুষগুলো, যে চরিত্রগুলো সৃষ্টি হবে, সেগুলো উন্নত স্তরের চরিত্র হবে তো? অথচ, এদেশে তথাকথিত কমিউনিস্টদের মধ্যে বাস্তবে কী দেখতে পান? শরৎচন্দ্রের আমলে ওইরকম যে ভারতবর্ষের কোমরভাঙা স্বাধীনতা আন্দোলন, যার মধ্যে কত দুর্বলতা ছিল, যে আন্দোলন ধর্ম থেকে মুক্ত হতে পারেনি —

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও যার মূল ধারাটি আপসহীন ছিল না, যে সময়ে নেতারাও রাজনৈতিক আন্দোলনের তাড়াহুড়ায় সমাজ বিপ্লবের ঝান্ডাটি ফেলে দিয়েছিলেন — রাজনৈতিক আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনী যাঁরা, সবচেয়ে অগ্রণী অংশ যাঁরা, তাঁরাও তখন ধর্মের সঙ্গে এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে আপস করেছেন — আপস করেছেন সামাজিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে, এমনকি পারিবারিক ক্ষেত্রেও। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও শরৎ সাহিত্যের মতো সাহিত্যের কার্যকারিতা ছিল বলেই সেই আন্দোলনের ভাবধারায় যারা প্রবাহিত হয়েছে, বাংলা দেশের সেই যুবকদের মধ্যে, এই দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে চরিত্রের যে দৃঢ়তা দেখতে পেয়েছি, আজ তথাকথিত কমিউনিস্টরা, যাঁরা তাদের চেয়ে অনেক বেশি তত্ত্ব আলোচনা করেন, বিশ্লেষণ করেন, বক্তৃতাবাজি করেন, কিন্তু চরিত্রের সেদিনকার সেই উন্নত মানটুকু পর্যন্ত তাঁরা বজায় রাখতে পারছেন না। আজকের দিনের কমিউনিস্টদের যেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের চেয়েও, ক্ষুদিরামের চেয়েও, পুরনো বিপ্লবীদের চেয়েও উন্নত মডেলের হওয়ার কথা, সেখানে সেটুকু হওয়া তো দূরের কথা, সেদিনকার তুলনায় অধঃপতিত মান এদের। কারণ জানেন? কারণ হচ্ছে, এদেশে শরৎসাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন করতে না পারা, এমনকি তথাকথিত প্রগতিশীলদের দ্বারা তাঁর অস্বীকৃতি, মানুষ শরৎচন্দ্রকে ঠিকমতো বুঝতে না পারা। এর ফলেই অতীতের থেকে ছেদ করতে গিয়ে আমরা কনটিনিউয়িটির সুরটি হারিয়ে ফেলেছি এবং ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি।

ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে, শরৎচন্দ্রকে তাঁরা অবহেলা করেছেন। শরৎসাহিত্যে যাঁরা বড় বড় কথা খুঁজতে গেছেন — তাঁরাই শরৎচন্দ্রকে বুঝতে পারেননি। আবার যাঁরা শরৎচন্দ্রকে প্রশংসা করেছেন, তারাও শরৎসাহিত্যের যথার্থ মর্মার্থ ও গুরুত্ব অনুভব করতে না পারার ফলে তাঁকে শুধু ‘মিষ্টি গল্প লেখক’, ‘দরদি লেখক’ বা ‘কথাসাহিত্যিক’ আখ্যা দিয়েছেন। পূর্ববাংলার একদল পণ্ডিত লোক একসময় বাংলাদেশের দেশাত্মবোধ গড়ে ওঠার পেছনে রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের অবদান সম্পর্কে নানা লোকের লেখা সংগ্রহ করে এখান থেকে একটা সংকলন বের করেছিলেন। তাঁরা আমার কাছেও একটা লেখা চেয়েছিলেন। আমি তাঁদের বলেছিলাম, আমি লিখব একটা শর্তে, তা হচ্ছে যদি বাংলাদেশের দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলার পেছনে সত্যিকারের কার কী অবদান লিখতে হয়, তাহলে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের তুলনামূলক বিচার করতে আমাকে দিতে হবে। যদি আপনারা সেটা স্বীকার করেন, তাহলে আমি লিখব। তা না হলে আমার বিশ্বাস, শরৎচন্দ্রকে বাদ দিয়ে যে দেশাত্মবোধের চর্চা হবে, তাতে মুজিবর রহমানের মতো ‘ডেসপট’-ই তৈরি হবে এবং বাংলাদেশে সংস্কৃতি অচিরেই গভীর সংকটের মধ্যে পড়বে। আর সংস্কৃতিগত আন্দোলনের এই দৈন্যের জন্যই তার

প্রগতিশীল ভাবনা-ধারণাগুলোও মুখ থুবড়ে পড়বে। সেখানে কমিউনিজমের বুকনি হবে, ঘরে ঘরে ছেলেরা কমিউনিস্ট হওয়ার জন্য বিপ্লবী হওয়ার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে মাঠে ময়দানে, জেলে, গুলির মুখে প্রাণ দিতে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু নিম্নগামী সংস্কৃতির জন্য অল্পদিনের মধ্যেই তারা ভিন্ন চরিত্রের লোক হয়ে যাবে, তারা সুবিধাবাদী হবে, অথবা অন্য কিছু হবে। কিন্তু কমিউনিস্ট হবে না, যেমন ভারতবর্ষে ঘটেছে। এখানে তথাকথিত কমিউনিস্টদের দেখে বহু লোকের তাই ধারণা হচ্ছে যে একদিন যারা অত্যন্ত সৎ ছিল, সব কিছু দেওয়ার জন্যই ওদের আন্দোলনে এসেছিল, কিছুদিন আন্দোলনে থাকার পরই তারা সুবিধাবাদী হয়ে পড়ছে, ধুরন্ধর হয়ে পড়ছে, নানারকম প্যাঁচ কষছে এবং নানা রকমের দুর্নীতির ‘ভিক্টিম’ হচ্ছে। তাদের মধ্যে সংস্কৃতিগত মান কোনও কিছুই প্রতিফলিত হচ্ছে না। এসব দেখে যাঁরা ওদের মধ্যে পুরনো লোক, যাঁরা পুরনো মানবতাবাদী সংস্কৃতির আঁচ এখনও মনের মধ্যে অনুভব করেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই আন্দোলন থেকে সরে যাচ্ছেন। তাঁরা আজকালকার যুবকদের সংস্কৃতি এবং রুচির অত্যন্ত নিম্নমান দেখে আঁতকে উঠছেন। কিন্তু, তাঁরা সমস্যাটার গভীরে ঢোকার এবং কেন এরকম হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করছেন না।

এটা হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, যে শরৎসাহিত্যে সূক্ষ্মরসের কারবার হয়েছে, তাকে তাঁরা অবহেলা করেছেন, নিম্নস্তরের সাহিত্য বলে অবজ্ঞা করেছেন, তাঁরা সাহিত্যে শুধু বড় বড় কথার কারবার করেছেন। আর শরৎচন্দ্রকে অবজ্ঞা করে এখানে প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করতে যাওয়ার যে বিড়ম্বনা, তাই হয়েছে। তার দ্বারা প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। একটা গোষ্ঠী জুটলেই যেমন তার তল্পিবাহক জোটে, তার কিছু প্রচার প্রোপাগান্ডা হয় এবং তার দ্বারা তারা কিছুদিন করে খায় — এখানে প্রগতিশীল সাহিত্যের নামে তাই হয়েছে, আর বিশেষ কিছু হয়নি। একেবারে কিছুই হয়নি একথা আমি বলতে চাইছি না। কিন্তু, এখানে কে কতটুকু কোন জায়গায় কিছু সাফল্য লাভ করেছেন এবং তার জন্য যদি কৃতিত্ব তাদের দিতেও হয়, তা সত্ত্বেও আমি যেটা মূল জিনিস বিচার করছি তা হচ্ছে, মূলত তাদের সাহিত্য-প্রচেষ্টা একটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ, সমাজ মানসিকতায় এবং বামপন্থী আন্দোলন ও শ্রেণি সংগ্রামের সমর্থক মানুষদের মধ্যে তাঁরা শরৎচন্দ্রের সময়কার যুবকদের চেয়েও উন্নততর নতুন মানসিকতা গড়ে তোলা দূরে থাকুক, যে শরৎসাহিত্যে নিম্নরসের কারবার হয়েছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের ধারণা মতো সেই নিম্নরসের কারবার করেই শরৎচন্দ্র উন্নত সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ যতটুকু গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাও তাঁরা রক্ষা করতে পারেননি। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য মানুষের সংস্কৃতিকে আরও নিম্নগামী করে ফেলছে। অথচ, আজ যেমন করে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব এই

তথাকথিত কমিউনিস্টদের হাতে রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে থেকেছে, শরৎচন্দ্র তেমন করে তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন না। বাংলার বিপ্লববাদীদের হাতেও ছিল না, ছিল আপসপন্থী বুর্জোয়াদের হাতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব তাদের হাতে কুক্ষিগত থাকা সত্ত্বেও অবিভক্ত বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে, এই দেশের সংস্কৃতিতে যতটুকু প্রভাব শরৎচন্দ্র বিস্তার করেছিলেন, তাতেই সেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে রুচি, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শবাদ ও শালীনতার যে মান আমরা দেখেছি, আজকের এই তথাকথিত কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমর্থকবৃন্দের মধ্যে ততটুকুও কি প্রতিফলিত হচ্ছে? বাস্তবে তার থেকেও নিম্নস্তরের হচ্ছে। অথচ শ্রমিক সংস্কৃতি হবে তার চেয়ে আরও উন্নত, আরও মহৎ, আরও সুন্দর — যা দেখে মানুষের বুক টনটন করে উঠবে, আত্মবিস্মৃত মানুষগুলো নিজেকে পুনরায় আবিষ্কার করবে, সামাজিক আন্দোলন থেকে পালিয়ে যাওয়া মানুষগুলো আবার নড়েচড়ে বসবে। শ্রমিক সংস্কৃতি হবে এমন জিনিস। তাহলে কমিউনিস্ট সাহিত্যের নামে, সর্বহারা সাহিত্যের নামে যা তাঁরা লিখছেন, তা কী ভূমিকা পালন করল? না করতে পারার কারণ কী?

এর কারণ কি তাঁরা বড় বড় কথা বলতে পারেননি? শ্রেণি সংগ্রামের কথা, শোষণের কথা, মালিকদের বিরুদ্ধে কথা, অত্যাচারের কাহিনী তাঁরা বলতে পারেননি? বলতে পেরেছেন, কিন্তু বলেছেন অত্যন্ত নিম্নরস এবং নিম্নস্তরের ফর্মের মাধ্যমে। তাই মানুষের রুচিকে তারা নিম্নগামী করেছেন এবং তাঁদের সেই বড় কথাগুলোর কার্যকারিতাই সৃষ্টি হয়নি। আমার এই বক্তব্যটা আপনারা ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করবেন। যদি আমার সঙ্গে আপনাদের মতবিরোধ হয়, আমি যা বলতে চেয়েছি তাতে যদি কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে থাকি, তাহলে আপনারা ভুল বুঝে বললেও আমার কাছে এলে আমার বুদ্ধি অনুযায়ী আমি যা বলতে চেয়েছি, তা প্রকাশ করার চেষ্টা করব। আমি এই কথাটাই বলতে চেয়েছি যে, শরৎচন্দ্রকে যাঁরা বুঝতে পারবেন, অর্থাৎ যাঁরা শরৎ সাহিত্যের যথার্থ উত্তরসাধক হবেন, তাঁরাই সর্বহারা সংস্কৃতিকে এদেশে জন্ম দিতে পারবেন। শরৎচন্দ্রকে যাঁরা অবহেলা করেছেন, তাঁরা মানবতাবাদের সর্বোচ্চ ভাবনা ধারণা, রুচি সংস্কৃতির যে সূক্ষ্মতম কারবারি, তাকেই অনুধাবন করতে পারেননি। ফলে, তাঁরা মোটা কথা বলেছেন, বড় কথা বলেছেন, কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবের কারবার করেননি। কাজেই তাঁরা সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারেননি। তাঁরা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বা অন্যান্য সংস্কৃতিবিদদের নিয়ে যত বড় বড় বক্তৃতার এবং কথার ফাঁদই পাড়ুন, তাঁদের দ্বারা সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম হবে না। রবীন্দ্রোত্তর, শরতোত্তর সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম দিতে একমাত্র তাঁরাই পারবেন, যাঁরা শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলির কারবারের কারবারি এবং সেই

অনুভূতিগুলিকে উপলব্ধি করে তাকে নিঃশেষ করে আরও উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পেরেছেন।

শরৎসাহিত্যে শিল্পশৈলী বিশ্বসাহিত্যে তুলনাহীন

আমি বিদেশি সাহিত্য খুব বেশি পড়িনি। অন্তত যাঁরা মাস্টারমশাই লোক, তাঁদের মতো তো পড়িইনি। তবে বড় বড় সাহিত্যিকদের লেখা, অর্থাৎ যাঁরা নামকরা সাহিত্যিক তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেরই বই, সব নয়, কিছু কিছু অন্তত পড়েছি। অনেকের বই কিছু বেশি পড়েছি। কিন্তু বচনভঙ্গিমা, প্রকাশভঙ্গি এবং সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতার দিকটা শরৎচন্দ্রের মতো আমি কারোর মধ্যেই পাইনি। তত্ত্বের কথা এলেই তাঁদের অনেকের মধ্যেই দেখা গেছে বক্তৃতা করার ঝোঁক বেশি। শরৎচন্দ্র কিন্তু সেই তত্ত্বেরই জয়গান করেছেন গল্পের বাঁধুনিতে। এমন ক্ষমতা আমার তো চোখেই পড়ে না। আমাকে যদি এমন কোনও সাহিত্যিকের কথা কেউ বলে দিতে পারেন, যিনি এইরকম শরৎচন্দ্রের মতো এতসব তত্ত্বের কথা, রসবোধের কথা ব্যাখ্যা করে, বিশ্লেষণ করে কোনও বইয়ের পাতায় পাতায় বোঝাননি, গল্পের মাধ্যমে সেই তত্ত্বগুলো এনেছেন, তাহলে আমি মেনে নেব। অন্তত এরকম কেউ আমার চোখে পড়েনি।

সাহিত্য শৈলীতে তাঁকে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ বলি কী অর্থে জানেন? কারণ, গ্রহণ করতে পারলে, বুঝতে পারলে দেখা যাবে, তাঁর সাহিত্যে তত্ত্বের সব বড় বড় কথা আছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মানবতাবাদী মূল্যবোধের সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে, তদানীন্তন বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের উন্নত চিন্তা-ভাবনার বহু জিনিস তাঁর সাহিত্যের পাতায় পাতায় লুকিয়ে আছে— অথচ কোথাও বক্তৃতা নেই, পাতার পর পাতা ব্যাখ্যা নেই, শুধু 'ডায়ালগ'-এর ওপর টেনে বেরিয়ে গেছেন, যা কোথাও বিরক্তিকর লাগবে না। গল্পছন্দ, হৃদয়াবেগের উপস্থাপনা, মান-অভিমানের কাহিনীর সমাবেশ এমনভাবে করেছেন যে, কাহিনীগুলো পড়তে পড়তে তাতেই ব্যস্ত থেকে চরিত্রগুলোর হাসিকান্নার মধ্যে আপনি দোল খাবেন এবং তারই মধ্যে আপনি তত্ত্বের বড় বিষয়গুলি গ্রহণ করতে পারবেন। তারই মধ্যে আপনি 'এথিক্যাল মাদারহুড', 'এথিক্যাল ব্রাদারহুড', উন্নত সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা ধারণা বা উচ্চ চিন্তা-ভাবনার ধারণাগুলোর হদিশ পেতে থাকবেন। অথচ, পড়ছেন আপনি গল্প— যা আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে। প্রত্যেকটা বই এমন যে, নিয়ে বসলে ছাত্র বয়সেও দেখেছি ঘুম চলে যায়, রাত ভোর হয়ে যেতে চায়, কিন্তু শেষ না করে ওঠা যায় না, টেনে নিয়ে চলে যায়। এটা সোজা কথা নয়। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে তত্ত্বের বড় বড় কথাগুলোই বলেছেন। কিন্তু বলেছেন গল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে, রসের মাধ্যমে। তিনি তত্ত্বকথা লিখে কোথাও বোঝাতে চাননি — আমি এইখানে এই তত্ত্ব আলোচনা

করেছি, এই বক্তব্য রাখছি। সাহিত্যিক হিসাবে এইখানে তাঁর সার্থকতা সবচাইতে বেশি।

তার পাশাপাশি অন্য সব বড় সাহিত্যিকদেরও দেখেছি— তাঁদের বইয়ে অনেক বড় কথা আছে, কিন্তু কোন পর্যন্ত পড়া হল বইয়ের পাতায় তা দাগ দিয়ে রাখতে হয়, একবারে শেষ করা যায় না। কিছুক্ষণ পড়ার পর মনে হয়, এখন স্নান করে, খেয়েদেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করি তারপর আবার পাতা খুলে বসব। পাতার পর পাতা এটা কী হল, ওটা কী হল, তারই ব্যাখ্যা। 'উনি এইরকম করিলেন' বলেই ওনার কী মানসিক দ্বন্দ্ব হতে থাকল এবং কীভাবে হতে থাকল তার ওপর তিন পাতা বর্ণনা— তারপর আবার একটা ডায়ালগ। কী বলতে চান সব বুঝিয়ে ছাড়ছেন— পাঠকের বোঝার জন্য আর কিছু বাকি রাখছেন না। এরকম অনেক সাহিত্যিক আছেন। সাহিত্য জগতের কিছু লোক, যাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, শরৎ সাহিত্য সম্পর্কে আমার মতামত শুনে বলেছেন, আমি নাকি এটা অনেক বাড়িয়ে বলছি। আমি তাঁদের বলেছিলাম, যতদূর পর্যন্ত আমি বিশ্বের সাহিত্যের খবর রাখি এবং বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যিকের বই পড়ে, আমার যা মনে হয়েছে তা হচ্ছে, শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক সময়ে উপন্যাস, গল্প এবং ডায়ালগ সাহিত্যে তাঁর পাশাপাশি কেউ দাঁড়াতে পারে না। সাহিত্যের চিন্তাভাবনার বিষয়বস্তুর অর্থে তাঁর মতো অনেক সাহিত্যিক আছেন, যদিও সেইদিক থেকেও তিনি আমাদের দেশে একেবারে সর্বহারা শ্রেণিচিন্তার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু, গোর্কির কথা ধরুন। চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে যদি ধরেন, তাহলে শরৎচন্দ্রর থেকে সরাসরি আরও অগ্রসর চিন্তা তিনি সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। কিন্তু, সাহিত্যের শিল্পশৈলীর অর্থে, রসসাহিত্যের অর্থে শরৎচন্দ্রর ক্ষমতার সাথে তাঁর তুলনা চলে না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই প্রশ্নে কারোর তুলনা হয় না।

অনেকে এ-প্রসঙ্গে টলস্টয়ের কথা উল্লেখ করতে পারেন। সেখানেও আমি বলব, ব্যাখ্যা না করে শুধু ডায়ালগ-এর ওপর সমস্ত বড় কথা বলেছেন, আগাগোড়া শুধু গল্প বলার মধ্য দিয়ে, রসের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে গেছেন— এমন একজন সাহিত্যিককেও দেখাতে পারবেন না— টলস্টয়কেও না। তাঁর সাহিত্যেও পাতার পর পাতা ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা আছেই। একমাত্র তাঁর একখানা বই আছে 'রেসারেকশন', যেখানে বর্ণনা কম, ডায়ালগ অনেক বেশি। তবুও তাঁর সেই বইও বর্ণনার থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়। কিন্তু, শরৎচন্দ্রর কোনও বইই তা নয়। তাঁর বইয়ে বর্ণনা যেখানে আছে, সেখানেও চরিত্রের সঙ্গে সেটা 'ডেপিকশন' হয়ে আছে, যেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। যেমন ধরুন, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রথম পর্বে অন্ধকারের রূপ বর্ণনা আছে। সেটা এমনভাবে আসেনি যে, তিনি চরিত্র ব্যাখ্যা করছেন বা নানা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন। সেটা একটা কাব্য হয়ে গেছে, গদ্য কাব্য—

যা 'লিরিক'-এর পর্যায়ে পড়ে— সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যদিও তারই সঙ্গে লুক্কায়িত হয়তো দু'টো কথা এসেছে, একটা নতুন সত্যকে প্রতিভাত করার জন্য এসেছে— কিন্তু তা কবিতা। পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে গদ্যকাব্যের মধ্য দিয়ে। তাঁর বড় বড় মোটা মোটা সব বই 'পথের দাবী', 'চরিত্রহীন' পড়ুন— কোথাও ওই ধরনের বর্ণনা বিশেষ পাবেন না। তার এতবড় সাড়ে চারশো পাতার বই 'চরিত্রহীন'— শুধু গল্প আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে, কোথাও বিরক্তিকর লাগবে না। উপন্যাস সাহিত্যে, ডায়ালগ সাহিত্যে এ জিনিস কেউ দেখাতে পারবে না। দেখালে আমি মেনে নেব। অনেকে মম্ বা মোপাশাঁর উদাহরণ দেন। আমি মম্ পড়েছি, মোপাশাঁও পড়েছি। আমি বুঝি, তাঁরা খুব উঁচু দরের গল্প লেখক। কিন্তু, রসসাহিত্যের যে জায়গাটায় শরৎচন্দ্র উঠেছিলেন, যে সূক্ষ্ম রসের কারবার তিনি করেছেন এবং যত সহজে সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি করেছেন, ততটা এঁদের মধ্যে দেখতে পাইনি।

ডায়ালগপ্রধান উপন্যাস সৃষ্টিতে বিশ্বসাহিত্যে শরৎচন্দ্র অনন্য

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যশিল্প, অর্থাৎ তাঁর গল্প লেখার বাঁধুনি, এবং গল্প বলার ধরনকে শুধুমাত্র যদি কেউ রসের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার অধিকারী হন এবং সত্যিসত্যিই তার রস উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে তাঁর বুঝতে বোধ হয় কষ্ট হবে না যে, শুধু আমাদের দেশে কেন, এইদিক থেকে বিশ্বসাহিত্যেও তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। অনেকে তাঁকে 'বাংলার ডিকেন্স' বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমি বলি, 'বাংলার ডিকেন্স' বললে তাঁর গৌরব বাড়ে না। ডিকেন্স শরৎচন্দ্রের আগের লোক বলে কথাটা হয়তো এভাবে বলা চলে না যে, 'ডিকেন্স ইংল্যান্ডের শরৎচন্দ্র' ছিলেন, নাহলে কথাটা এইভাবে বলতে পারলেই ঠিক হত। কিন্তু কোনওমতেই তাঁকে 'বাংলার ডিকেন্স' বলা চলে না। সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমরা প্রায়ই ভুল করি। একটা হচ্ছে সাহিত্যের চিন্তাগত দিক, অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিকের চিন্তা-ভাবনা যেটা প্রতিফলিত হয়েছে সেটা। সেইদিক থেকে শরৎসাহিত্যে চিন্তা-ভাবনা যা প্রতিফলিত হয়েছে, অনেক লোক হয়তো চিন্তা-ভাবনায় তার চেয়ে কিছুটা অগ্রসর হতে পারে। যেমন আমরা কমিউনিস্টরা, চিন্তার দিক থেকে অনেক অগ্রসর হয়েছি এবং আজকাল আমরা এমন অনেক চিন্তা করি, যা শরৎচন্দ্র চিন্তা করেননি। শরৎচন্দ্রের মূল চিন্তার সঙ্গে আমাদের বিরোধও আছে। তা সত্ত্বেও আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি এই শিল্পপ্রতিভায় সাহিত্যের বচনভঙ্গি এবং প্রকাশ করার ক্ষমতায় তিনি আজও অনন্য, বিশ্বসাহিত্যে যার তুলনা আজও পাওয়া যায় না। আগেই বলেছি, বিদেশি সাহিত্য আমারও কিছু কিছু পড়া আছে। ডিকেন্সের স্তর থেকে 'ডায়ালগ' সাহিত্যকে তিনি সম্পূর্ণ একটা নতুন উন্নত স্তর এবং পর্দায় এনে ফেলেছেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যও কথাসাহিত্য বা ডায়ালগ সাহিত্য, কিন্তু

ডায়ালগ সাহিত্যের এটা একটা সম্পূর্ণ ভিন্নতর স্তর।

আমার এইকথাটা বোঝাবার জন্য আমি আপনাদের কাছে একটা ঘটনা বলছি। শরৎবাবুর অনুগামীরা তাঁকে একসময় একটা প্রশ্ন করেছিলেন যে, বিশ্বের যত বড় বড় সাহিত্যিক — টলস্টয়, বার্ণার্ড শ' থেকে শুরু করে ডস্টয়ভস্কি, এমনকি রঁম্যা রঁল্যা পর্যন্ত এইরকম সকলেরই বইয়ের ভূমিকা থাকে। বার্ণার্ড শ'-র তো বইটা এতটুকু, ভূমিকা তার থেকে বেশি — একেবারে এতখানি ভূমিকা। কিন্তু, আপনার বইগুলোর কোনও ভূমিকা নেই কেন? কাজেই ভূমিকা লিখে সেগুলো একটু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে ভাল হয়। তাঁদের প্রশ্নের ভারী সুন্দর উত্তর করেছেন শরৎচন্দ্র। বললেন, দেখ, চারশো পাতার বই লিখেছি। তাও গল্প লিখেছি, প্রবন্ধ লিখিনি। এই চারশো পাতার বইয়ে গল্প বলার মধ্য দিয়ে যে কথাগুলো বলতে চেয়েছি সেগুলো যদি না বোঝাতে পেরে থাকি, তাহলে কী কী বিষয় নিয়ে লিখলাম, সেটা ষোল পাতার ভূমিকার আকারে বুঝিয়ে দিলেই কি ধরাতে পারব? তাই আমি লিখিনি।

কথাটা যথার্থই তাই। ঘরের সাধারণ একজন বৌ-ঝি থেকে আরম্ভ করে একেবারে একজন জ্ঞানীর স্তর পর্যন্ত, চিত্তরঞ্জন দাশের স্তরের মানুষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য থেকে সমানে রস গ্রহণ করে গেছেন। এর মানে কি সকলে একই রস গ্রহণ করেছেন? সাধারণ লেখাপড়া জানা ঘরের একজন সাধারণ বৌ তাঁর সাহিত্য যেমন বুঝছে, তেমন করে কি চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষ বোস বুঝেছেন? না, তেমন করে আমি বুঝেছি? একইরকম করে তো আমরা বুঝছি না। কিন্তু, প্রত্যেকেই রস গ্রহণ করছি। আর অদ্ভুত কথা হচ্ছে, তাঁর সাহিত্য একজন ঘরের বৌকেও যেমন খানিকটা বড় করে দিয়েছে, চিত্তরঞ্জন দাশকেও তেমনি পথ দেখিয়েছে — প্রত্যেককেই তাঁর তাঁর স্তরে রুচি-সংস্কৃতির একটা কাঠামো বেঁধে দিয়েছে। আমাকেও আজকে সর্বহারা সংস্কৃতির বুনিয়াদ এবং আধার তৈরি করার বিষয়বস্তুগুলো জুগিয়ে দিচ্ছে— আর, তাঁর সাহিত্য স্বদেশি আন্দোলনে তো আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেই। আমি নিজে স্বাধীনতা আন্দোলনে শরৎসাহিত্যের দ্বারা উদ্বুদ্ধ একজন মানুষ। কাজেই দেখা যাচ্ছে কী? জ্ঞানী হোক, অথবা সাধারণ লেখাপড়া জানা লোক হোক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হোক, অথবা তদানীন্তন সময়ের খুব অগ্রগামী চিন্তাশীল ব্যক্তি হোক, শরৎসাহিত্য সকল মানুষের মধ্যেই স্তরে স্তরে যার যার আপন বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে কিছু না কিছু কাজ করেছে। এইখানেই সাহিত্যের সার্থকতা। এইখানেই সাহিত্যের শিল্পশৈলীর প্রশ্ন।

শরৎ সাহিত্যে ফর্মের পাশাপাশি কনটেন্টও ছিল উন্নত

আগেই বলেছি, সাহিত্যের দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে তার চিন্তার দিক, সেইখানে বিচার করতে হয়, যে চিন্তা-ভাবনা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত

হয়েছে, তা কোন স্তরের। কিন্তু, সাহিত্যিক বড় কি না, তা শুধু বড় চিন্তা দিয়ে প্রমাণ হয় না। বড় চিন্তা থাকলেই বড় সাহিত্যিক হয় না। কোনও সাহিত্যিক বড় কি না, তার প্রমাণ হয়, তার শিল্পশৈলী বা সাহিত্যের ফর্মও উন্নত স্তরের কি না — তার দ্বারা। অর্থাৎ, কোনও সাহিত্য বিচারের সময় প্রধানত লক্ষ রাখতে হয় সাহিত্যকর্মের যেটা উন্নত ফর্ম দুনিয়ায় সৃষ্টি হয়ে আছে, যার কার্যকারিতা পরীক্ষিত হয়ে আছে, আমরা যে সাহিত্য বিচার করছি, তার শিল্প ফর্ম সেই একই স্তরের বা তার থেকে উন্নত স্তরের কি না। কারণ, সাহিত্য শিল্পের যে উন্নত ফর্ম ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে আছে, কোনও সাহিত্যের শিল্প ফর্ম যদি তার থেকে নিম্নগামী হয়ে পড়ে, তাহলে তার দ্বারা একটা অনিষ্টই ঘটে। হাজার বড় কথা তার মধ্যে থাকলেও শিল্প ফর্মটা নিচু হওয়ার ফলে তার দ্বারা মানুষের রুচিগত, চরিত্রগত মানসিকতা বড় করে গড়ে তুলতে অনেক কষ্ট হয়। ধরুন, ডায়ালগ করার, গল্পবিন্যাস করার মাপকাঠিতে রুচির এবং বচনভঙ্গির একটা অত্যন্ত উন্নত এবং সুরুচিসম্পন্ন ফর্ম সাহিত্যে সৃষ্টি হয়ে আছে। এখন পরবর্তী সময়ে এসে কোনও সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তার চিন্তাটা সাহিত্যের আগের সেই উন্নত ফর্ম এর মধ্যে যে চিন্তা ছিল তার থেকেও অনেক উন্নত ধরনের, তার থেকেও অনেক উঁচুস্তরের কথা তিনি চিন্তা করেছেন, অথচ তার সাহিত্য ফর্মটা নিম্নস্তরের , তার বচনভঙ্গি, তার বাক্য বিন্যাসের ঢং এবং তার গল্প বলার কায়দা আগের থেকে নিম্নস্তরের — তাহলে ওই বড় কথাগুলো দিয়েও তিনি আশানুরূপ ফল পাবেন না। বরং তার দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়াটা নিম্নমুখীই হবে। এ অনেকটা কীরকম হবে জানেন। ধরে নিন, একজন বড় কথা শেখানোর চেষ্টা করছেন। সেই সমস্ত বড় বড় কথাগুলো তিনি মালা গাঁথার মতো করে বলতে পারেন। অথচ তার নিজের চরিত্রের ভিতই কিছু নেই এবং সেই জন্যে সেই বড় কথাগুলোর কোনও প্রতিক্রিয়া বা প্রতিফলনও তার মধ্যে নেই। তাহলে কী হবে? না, অনেক বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও সেই মানুষটিকে অত্যন্ত বাজে ধরনের, অত্যন্ত নিচু ধরনের মানুষ মনে হবে। এ জিনিস অসম্ভব নয়। সাহিত্যের ফর্ম নিম্নস্তরের হলে ঠিক এই জিনিসই ঘটবে। উচ্চ চিন্তাকে পরিবহন করার জন্যই সাহিত্য ফর্মের কার্যকারিতা। তাই সাহিত্যের ফর্ম এবং কনটেন্ট এই দুটো একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কখনই এরকম হতে পারে না যে, কারোর কনটেন্ট অনেক এগিয়ে গেল, কিন্তু ফর্মটা অনেক নিচে পড়ে রইল। এইরকম হলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে যে, যে কনটেন্টটাকে তিনি খুব উন্নত বলে মনে করছেন, সেটা একটা বাহ্যিক আড়ম্বরে পর্যবসিত হবে। কারণ, ফর্ম-এর দৈন্যের জন্যই প্রমাণ হয় কনটেন্টটা উচ্চস্তরের নয়, অর্থাৎ তার সেই কার্যকারিতা থাকে না। সাহিত্যের এই শিল্পশৈলীর দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে শরৎচন্দ্র সত্যিই একটা অদ্ভুত জায়গা দখল করে আছেন।

তাই কোনও সাহিত্যিকের সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে কনটেন্ট এবং ফর্ম এই দুটো দিককে এক করে ফেলে গোলমাল করা উচিত নয়। একটি তার চিন্তার দিক, আর একটি তার রসোত্তীর্ণ হওয়ার দিক — কত উচ্চমানের রস সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম, কত সূক্ষ্ম রসের কারবার করতে সক্ষম। এই দিক থেকে যদি বিচার করা যায় তাহলে দেখা যাবে, শরৎ সাহিত্যে এই রস পরিবেশন করার প্রক্রিয়া এত সূক্ষ্ম যে, মানুষ কিছু না বুঝেই শুধু তার রস গ্রহণ করতে করতেই খানিকটা পাল্টে যায়। এই ক্ষমতার দিক থেকে, সাহিত্য শৈলীতে তদানীন্তন সাহিত্যিকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, একথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি। জানি না আমার এই মূল্যায়নের সাথে অন্যান্যদের বিরোধ হবে কি না। আর চিন্তাগত দিক থেকে আমি আগেই বলেছি, স্থানকালের পরিবেশে যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখব, সাহিত্যে তাঁর চিন্তা-ভাবনা যতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, তা সবসময়েই বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের সুরকেই প্রতিফলিত করেছে। শরৎচিন্তায় বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সমস্ত বৈচিত্রময় দিকই সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে একথা আমি বলছি না, কিন্তু বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদ একটা বিরাট ক্যাটিগরি নিয়ে তার সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে — তা আপসহীন এবং মূল দৃষ্টিভঙ্গিতে তা সেক্যুলার। ধারাবাহিকভাবে সবসময় সেক্যুলার এবং বস্তুতান্ত্রিক তিনি না থাকতে পারলেও অ্যাগনস্টিক হয়েছেন, কিন্তু অধ্যাত্মবাদকে মানেননি, ইতিহাস বিরুদ্ধ আচরণ করতে চাননি, যুক্তি বিরুদ্ধ কোনও বিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষের মনের মধ্যে কোনও কিছু ঢোকাবার চেষ্টা করতে চাননি। অতিপ্রাকৃতবাদের সাথে তাঁর সাহিত্যচিন্তা ও সাহিত্যকর্মে তিনি কখনও আপস করেননি। আর, রুচি এবং রস সৃষ্টির ক্ষেত্রে তো তিনি অদ্বিতীয় — মানবতাবাদী সূক্ষ মূল্যবোধগুলিকেই তিনি মানুষের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন বক্তৃতায় নয়, সূক্ষ্ম অনুভূতিতে গল্পে, ব্যথা-বেদনার সৃষ্টি করে। তিনি বললেন, কোনও ধর্মই আজ আর মানুষকে পথ দেখাতে পারে না। গল্পের মধ্য দিয়ে একেবারে 'রিটর্ট' করে করে তিনি দেখালেন, অধ্যাত্মবাদী দর্শন যত কূটযুক্তি করুক, ধর্ম দিয়ে কিছু হবে না।

বেদান্ত দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের নির্ভীক বিরোধিতা

শংকরাচার্য থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত মিলে বেদান্ত দর্শন ভারতের মানসিকতায় প্রচণ্ড প্রভাব নিয়ে আছে, বলতে গেলে ভারতবর্ষের মজ্জায় তা একেবারে মিশে আছে। অথচ, কী সাহসের সাথে শরৎচন্দ্র এই বেদান্ত দর্শনের বিরোধিতা করে গিয়েছেন। এমনকি ঈশ্বরকেও তিনি বিদ্রুপ করতে ছাড়েননি। আর, কখন তিনি এটা করেছেন? করেছেন সেই সময়ে, সমাজটা আজকের হিন্দুসমাজের মতো ছিল না — এ কথাটা ভুলে যাবেন না। আজ সমাজের বাঁধন অনেক আলগা

হয়ে গেছে। যদিও পুরনো সমাজের রেশ বা মানসিকতা থেকে আজও আমরা মুক্ত নই, তবুও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সমাজের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তার ফলে তার সেই বাঁধনটি বা তার সেই দাপটটি আর নেই। তখন হিন্দু সমাজটা পুরোপুরি ধর্মীয় প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিল। সেই ব্রাহ্মণ্য দাপটে পরিচালিত গোঁড়া হিন্দুসমাজের নাকের ডগায় বসে তিনি বলেছেন, "কোনও ধর্মগ্রন্থই কখনও অভ্রান্ত সত্য হতে পারে না। বেদও ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং, এতেও মিথ্যার অভাব নেই। যা বুদ্ধির বাইরে, তাকে বুদ্ধির বাইরে বলেই ত্যাগ করব। মুখে বলব, অব্যক্ত, অবোধ্য, অজ্ঞেয়, আর কাজে কথায় তাকেই ক্রমাগত বলবার চেষ্টা, জানবার চেষ্টা কিছুতেই করব না। যিনি করবেন তাকেও কোনও মতে সহ্য করব না"। ঠাট্টা করে বলেছেন, "... নির্গুণ, নিরাকার, নির্লিপ্ত, নির্বিকার এসব কেবল কথার কথা। এর কোনও মানে নেই। যে মুখে বলছেন জানা যায় না, সেই মুখেই আবার এত কথা বলছেন যেন এইমাত্র সমস্ত স্বচক্ষে দেখে এলেন। যাকে কোনমতেই উপলব্ধি করা যায় না, তাকেই উপলব্ধি করবার জন্য পাতার পর পাতা, বইয়ের পর বই লিখে যাচ্ছেন। কেন?" কারণ, কেউ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যদি ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করেন, তাহলেই তিনি ফেঁসে যাবেন। ছোট্ট কথার মধ্য দিয়ে বেদান্ত সম্বন্ধে কী ব্যঙ্গোক্তি করেছেন! তাঁর 'চরিত্রহীন' বইটা পড়ে দেখবেন, সেখানে উপনিষদ সম্বন্ধে তাঁর বিদ্রূপ কী তীব্র। প্রথমে সেখানে একটা ভূমিকা দিয়েছেন যে, উপনিষদের ধার্মিকরা খুব ভক্ত — যারা উপনিষদকে বেদ এবং একেবারে ব্রহ্মের উক্তি বলে মনে করেন এবং ওঁ শব্দের দ্বারা শুরু করেন, মনে করেন এ মানুষের কথা নয়, প্রফেটদের কথা ও বাণী, সেই উপনিষদ সম্বন্ধে ভক্তি জানিয়ে দিবাকর ও কিরণময়ীকে আলোচনা শুরু করালেন। কিরণময়ীর মুখ দিয়ে প্রথমে তাকে যমরাজার শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া এবং কোনও মানে হয় না এ ধরনের তার নানা কাজকর্ম সম্পর্কে একটা গল্প শোনালেন। কাহিনী শেষ করার আগেই দিবাকর হো হো করে হেসে উঠে বললো, 'এ কোন উপন্যাস শুরু করে দিলেন বৌদি?' কিরণময়ী নিরীহভাবে উত্তর দিল, 'কি করব ঠাকুরপো, যা পড়েছিলুম তাই বলছি। আচ্ছা এমন কাণ্ড হতে পারে বলে কি তোমার বিশ্বাস হয়?' সঙ্গে সঙ্গে দিবাকর বলছে, 'নিশ্চয় নয়। অসম্ভব'। কিরণময়ী উত্তর দিল, 'কেন অসম্ভব? ধর্মশাস্ত্রেই তো আছে।' দিবাকর বলল, 'থাক ধর্মশাস্ত্র। এ প্রক্ষিপ্ত উপন্যাস।' কিরণময়ী দিবাকরকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়ে বলল, 'এটা উপন্যাস না ঠাকুরপো?' দিবাকর উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।' কিরণময়ী হেসে বলে উঠল, 'এই উপন্যাসটির শেষভাগটা তোমার হাতের ঐ বইখানিতে পাবে।'

দিবাকর চমকে উঠে বলল, 'এই উপনিষদে'? কিরণময়ী কৌতুক করে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, ওতেই পাবে। বেশি খোঁজাখুজি করতে হবে না।' তারপর কিরণময়ীকে

দিয়ে শরৎচন্দ্র বলালেন, 'যা সত্য, তাকেই সকল সময় সকল অবস্থায় গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। তাতে বেদই মিথ্যা হোক, আর শাস্ত্রই মিথ্যা হয়ে যাক, সত্যের চেয়ে এরা বড় নয়, সত্যের তুলনায় এদের কোনও মূল্য নেই।' এইভাবে প্রথমে দিবাকরকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিল, যাতে তারপরে আর তর্ক করবার উপায় না থাকে। কারণ, মানুষের তর্কের ঝোঁকটা বড় অদ্ভুত। অপরপক্ষে যুক্তি থাকলেও সহজে মানতে চায় না। ইউরোপের পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগের রেনেসাঁসের যে দৃষ্টিভঙ্গি, শরৎচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গিও ঠিক তাই। সাহিত্যরসের মাধ্যমে কোথাও যুক্তি দেখিয়ে কোথাও বিদ্রূপাত্মক ঘটনার উপস্থাপনায়, কখনও ব্যঙ্গের রূপে ধর্ম-ইহকাল-পরকালের সংস্কারকে তিনি আঘাত করেছেন। আমাদের দেশে ধর্মীয় সংস্কারের পথে গড়ে ওঠা মানবতাবাদী আন্দোলন থেকে ছেদ ঘটিয়ে বিদ্যাসাগর যে ধারাটা নিয়ে এলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে শরৎচন্দ্রের মধ্যে এসে আবার মানবতাবাদী চিন্তাভাবনার সেই সুরটিই আমরা পাই, যেটা ইউরোপে রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রথম যুগের মানবতাবাদের আপসহীন ধারার মধ্যে আমরা দেখেছি।

শরৎসাহিত্য ও সর্বহারা সংস্কৃতি

তৎকালীন সময়ে সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র মূলত একজন সেক্যুলার হিউম্যানিস্ট ছিলেন, মার্কসবাদী ছিলেন না। সর্বহারা সংস্কৃতির তিনি জন্ম দেননি। আমরা কমিউনিস্টরা যেসব চিন্তা-ভাবনাকে লালন-পালন করি, সেই চিন্তা-ভাবনা বা ধ্যান-ধারণা শরৎসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়নি। ফলে, সর্বহারা সংস্কৃতির তিনি জন্ম দিয়েছেন কি না, বা মজুর-চাষির বিপ্লবের কথা তাঁর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে কি না — এ অন্তত তাঁর সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে মূল বিচার্য বিষয় নয়। শরৎসাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে হামেশাই যাঁরা এ ধরনের প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা আসলে ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করেন। আমরা আলোচনা করছি, তখনকার সামাজিক পরিস্থিতিতে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে আমাদের দেশে মানবতাবাদী চিন্তাধারার সবচেয়ে প্রগতিশীল ধারকবাহক কারা ছিলেন? অর্থাৎ ভারতবর্ষে তখনকার পরিস্থিতিতে বুর্জোয়া মানবতাবাদের সবচাইতে প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনাকে কারা প্রতিফলিত করেছেন? পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীরা কি? এদেশে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীরাই যদি তার প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, তাহলে শরৎচন্দ্র সেই চিন্তাকেই মূলত তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। কাজেই তৎকালীন যুগের বুর্জোয়া মানবতাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল চিন্তার মান এবং রুচির মানই এদেশে শরৎসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণির চিন্তা-ভাবনার কত কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র! শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশাতেই তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম হয়ে গিয়েছিল। ফলে, লেনিনের মতো

একটি সঠিক মার্কসবাদী নেতৃত্ব যদি সেইসময় এদেশে থাকত এবং সেই নেতৃত্ব যদি সাহিত্যকে প্রভাবিত করত সঠিক লাইনে, তাহলে গোর্কির মতো শরৎচন্দ্রের মারফতই এদেশে হয়তো সর্বহারা সাহিত্যের জন্ম হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল না। আর হলে তা গোর্কির চেয়ে অনেক উন্নত ধরনের সাহিত্য হত। কারণ, শরৎচন্দ্রের শিল্পশৈলী নিঃসন্দেহে গোর্কির চেয়ে উন্নত ধরনের।

ভারতবর্ষে মানবতাবাদী আন্দোলনের দুটো ভাবধারার কথা আমি আগেই বলেছি। তদানীন্তন সমাজপরিবেশে প্রগতি এবং প্রতিক্রিয়ার মাপকাঠিতে আমাদের বিচার করতে হবে যে, আমাদের দেশে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সময় রাজনীতিগত-সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে আপসমুখী ও আপসহীন যে দু'টি ধারা বর্তমান ছিল, তার মধ্যে কোন ধারাটি আজকের দিনে সমাজপ্রগতির আন্দোলন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। কোন ধারার কন্টিনিউটিতে বা অগ্রগতির পরিণতিতে আজকের নতুন শ্রেণিচেতনা — পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের চেতনা ও সর্বহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দেওয়া সম্ভব হতে পারে। বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদী ধারারই 'কনটিনিউয়িটি'-তে, তারই পরিণতিতে এদেশে সর্বহারা সংস্কৃতির সৃষ্টি হবে। তাই যারা সর্বহারা সংস্কৃতির উদ্‌গাতা হবে, তাদের এই বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদী ভাবধারার মানসিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে ভাল করে পরিচিত হতে হবে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটি সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে, রুচিগত ক্ষেত্রে যে নিম্নমান প্রতিফলিত করছে এবং সংশোধনবাদের যে রাস্তায় তারা বারবার ভুল করছে তার কারণওএইটা যে, তারা এই কথাটা বুঝতে পারেনি। তারা স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে রবীন্দ্র চাটুকারে পর্যবসিত হয়েছে। মনে রাখবেন, চাটুকাররা রবীন্দ্রনাথকে বোঝে না। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা ঠিক ঠিক বোঝেন, তাঁরা যন্ত্রণায় ছটফট করে আজকের মানুষের যথার্থ মুক্তির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। শরৎচন্দ্রকে যাঁরা বোঝেন, তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আমি রবীন্দ্র চাটুকার এইজন্য বলছি যে, রবীন্দ্রনাথকে বোঝা, আর রবীন্দ্রনাথের চাটুকারিতা — দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। আমার মতে, রবীন্দ্রনাথকে ঠিক ঠিক বোঝার মানে হচ্ছে, তাঁর সমাজ পরিবেশের মধ্যেই তাঁর গুণ এবং সীমাবদ্ধতার দিক দুটোই বুঝতে হবে। যাঁরা এভাবে রবীন্দ্রনাথকে বুঝবেন, তাঁরাই রবীন্দ্রত্তোর যুগের সত্যিকারের সংস্কৃতির স্রষ্টা হবেন। তাঁরাই বুঝবেন, রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী হওয়া মানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের চিন্তার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী — যে কথাটা বহু লোক মানেন না। উত্তরাধিকারী কথাটার মানে কী? যথার্থ উত্তরাধিকারী তো তিনিই, যিনি তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নতুন যুগের নতুন পথের নিশানা পেয়েছেন। তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নতুন পরিস্থিতিতে যখন তিনি চিন্তার সেই নতুন কাঠামোটি গড়বেন, তখন তার সঙ্গে পুরনো সেই চিন্তার অনেক ঐক্যের সুর থাকলেও মৌলিক বিরোধিতা থাকবে

দৃষ্টিভঙ্গিতে, আদর্শবাদে।

তাই সত্যিকারের উত্তরাধিকারী আপনারা রবীন্দ্রনাথেরই হোন, আর শরৎচন্দ্রেরই হোন, সর্বহারা সংস্কৃতি যদি আপনারা সৃষ্টি করতে চান, তাহলে আপনাদের মনে রাখতে হবে, আদর্শের ক্ষেত্রে, নীতিনৈতিকতার ক্ষেত্রে, ন্যায়নীতিতে, ভালমন্দ বিচারের যে মানদণ্ডটি তাঁরা তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, নতুন পরিস্থিতিতে তার পুনর্নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে আপনাদের আবার চিন্তাগত, আদর্শগত আপসহীন সংগ্রাম করতে হবে। এই বিরোধটিকে এড়িয়ে গিয়ে আপনারা শরতোত্তর, রবীন্দ্রোত্তর সর্বহারা সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারবেন না। আবার এঁদের যথার্থ উত্তরাধিকারী না হলে, উত্তরাধিকার সূত্রে এঁদের সমস্ত মূল্যবোধগুলোকে খুব ভালভাবে আয়ত্ত না করতে পারলে, তাঁদের দেওয়া সমস্ত সম্পদ ও অবদানকে নিঃশেষে গ্রহণ করতে না পারলে, আপনারা কতকগুলো 'কোটেশন' মুখস্ত করে আকাশ থেকে সর্বহারা সংস্কৃতি আনতে পারবেন না। এখন ভারতবর্ষে সঠিক সর্বহারা সংস্কৃতি, যেটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সমাজে আনতে চাইছে, আমি আগেই বলেছি, মানবতাবাদী দুই ধারার মধ্যে মূল যে ধারাটির কনটিনিউয়িটিতে আসবে, তা হচ্ছে, আপসহীন, সেক্যুলার, যৌবনোদ্দীপ্ত মানবতাবাদী ধারা — যেটা শরৎচন্দ্র প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যদিও শরৎচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা ও মূল্যবোধগুলির শক্ত ভিতের উপরেই আজকের দিনের সর্বহারা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে উঠবে — তবুও শরৎচিন্তার সঙ্গে বিরোধও তার অবশ্যম্ভাবী। তাই আমি মুক্তকণ্ঠে জোর দিয়ে এ কথাটি বলব যে, আমাদের দেশে সাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রই একমাত্র সাহিত্যিক, যিনি তখনকার দিনে সমাজবিপ্লবের ঝাণ্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, সমাজবিপ্লবের কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য একনিষ্ঠভাবে লড়েছেন। অন্যান্য সাহিত্যিকরা সমাজবিপ্লব সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে সমাজবিপ্লব আনয়নের জন্য যে জিনিসটির দরকার ছিল, তা করেননি। অর্থাৎ জনসাধারণের মধ্যে পুরনো সমাজের অকার্যকারিতা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করাবার জন্য মানুষের মনের মধ্যে দুঃখবেদনা, আক্ষেপ ও উন্নততর সমাজের জন্য অভাববোধ গড়ে তোলা — সাহিত্যের মাধ্যমে এই কাজগুলো তাঁরা করতে পারেননি। একমাত্র শরৎচন্দ্রই এদেশে সার্থকভাবে এই কাজগুলি করেছেন। তাই শরৎচন্দ্রের যথাযথ মূল্যায়ন যদি আপনারা না করতে পারেন, শরৎচন্দ্রের রসবোধ, শরৎচন্দ্রের সংস্কৃতিগত মান এবং তাঁর সমস্ত মূল্যবোধগুলোকে গ্রহণ করে যদি নিঃশেষিত করতে না পারেন, তাহলে সর্বহারা সংস্কৃতি আপনারা সৃষ্টি করতে পারবেন না, যতই রাজনীতিক্ষেত্রে কমিউনিজমের স্লোগান আপনারা তুলুন না কেন।

কারণ, যে কোনও বড় আদর্শের, যে কোনও বড় তত্ত্বের বা দর্শনের মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত ও রুচিগত মানের মধ্যে। এই সংস্কৃতিগত রুচিগত

দিকটা, নীতি নৈতিকতার দিকটা যদি নিম্নমানের হয়ে যায়, রসের দিকটা যদি নিচে নেমে যায়, তাহলে তত্ত্বের ঝলমলানি তার যতই থাকুক, কথা যত বড়ই থাকুক, তার প্রাণটাই থাকে না। এ হচ্ছে অনেকটা সুন্দর একটা মৃতদেহের মতো, যা ধরে রাখলে তাতে পচন ধরে। সেটা তখন শুধু একটা বোঝা এবং তা অনিষ্টকর। তেমনি সাহিত্যেরও যেটা প্রাণ, সেটা হচ্ছে তার এই রুচির মান, তার রসের মান, তার রসের গভীরতা। তাই রস সৃষ্টির উৎসটি সাহিত্যের একটা বড় জিনিস। এর সঙ্গে রয়েছে সাহিত্যের চিন্তাগত মান। এই চিন্তাগত বিষয়ের দিক থেকেও আমি আগেই বলেছি, শরৎসাহিত্য তৎকালীন সমাজে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিবেশে সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তার মানকে প্রতিফলিত করেছে, যার কনটিনিউয়িটিতেই আজকের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা সৃষ্টি হবে। কারণ, বুর্জোয়া মানবতাবাদের ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটিয়েই সর্বহারার সংস্কৃতি বা সর্বহারা মানবতাবাদের জন্ম, যে সর্বহারা মানবতাবাদকে আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি আমরা বলতে পারি। এই সর্বহারা সংস্কৃতি হঠাৎ করে শ্রমিকরা জন্ম দিতে পারে না, বা আকাশ থেকে তা পড়তেও পারে না। সর্বহারা সংস্কৃতির সাথে বুর্জোয়া সংস্কৃতির একটা নাড়ীর যোগ রয়েছে, আবার এক জায়গায় তার সাথে বিচ্ছেদও রয়েছে। পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগের যেটা সেক্যুলার মানবতাবাদ, যেটা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য এবং নারী স্বাধীনতার বলিষ্ঠ সুরকে প্রতিফলিত করেছে, যেটা সামন্তী সমাজের সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজবিপ্লবের ঝান্ডা তুলে ধরেছিল, যেটা সমস্ত দিক থেকে সমাজের মানসিক পরিবর্তন আনার জন্য রুচির সূক্ষ্মতম মানগুলোকে গড়ে তুলেছিল, তারই কনটিনিউয়িটিতে এবং ব্রেক ঘটিয়ে জন্ম নেবে শ্রমিকশ্রেণির সংস্কৃতি।

তাই আমাদের দেশে সর্বহারা সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা চর্চা করছেন, তাঁরা যদি শুধু শ্রমিকের জীবনকাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে শ্রমিকের দুঃখবেদনার একটা প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা, তার ওপর অত্যাচারের একটা জ্বলন্ত কাহিনী ফুটিয়ে তোলা, কিংবা তথাকথিত বামপন্থী নাট্যকারদের মতো শ্রমিকদের মুখে কিছু বড় বড় বিপ্লবী বুকনি তুলে দেওয়া আর শ্রমিকের প্রতি দরদ প্রকাশ করাটাকেই মনে করেন যে, শ্রমিক সাহিত্য হল, তাহলে তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে, মানবতাবাদীরাও এমন সাহিত্য করেছিল। রেনেসাঁসের সারা যুগ ধরে মানবতাবাদীরা শ্রমিকশ্রেণির দুর্দশা, তাদের ওপর প্রচণ্ড অত্যাচারের বহু বীভৎস ও করুণ কাহিনীর চিত্র তুলে ধরেছেন, জনসাধারণের প্রতি মমতা এবং ভালবাসা তাঁদের সাহিত্যে তাঁরাও ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু তা ছিল জনগণের প্রতি মানবতাবাদের দরদের চেহারা। শ্রমিক সংস্কৃতির চেহারা তা ছিল না। এমিল জোলা শ্রমিকদের জীবনকাহিনী নিয়ে জার্মিনাল উপন্যাস রচনা করলেও তাতে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির সংস্কৃতি আসেনি। শ্রমিকশ্রেণির সংস্কৃতির চেহারা হচ্ছে, মানবতাবাদের মধ্যে নিহিত এই দরদবোধের অবমাননা

থেকে মুক্ত করে শ্রমিককে তার আত্মমর্যাদা এবং যথার্থ চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং শ্রেণি সংগ্রাম এবং শ্রেণিনেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টাবার জন্য একটা নতুন ভাবনা-ধারণার সৃষ্টি করা। আর এই শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতি তাঁরাই সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন, যাঁরা মানবতাবাদের সমস্ত বিপ্লবাত্মক মূল্যবোধগুলোকে গ্রহণ করে নিঃশেষিত করতে পেরেছেন। মানুষগুলো যদি রুচি এবং নীতিনৈতিকতার দিক থেকে অধঃপতিতই থাকে, তাহলে শুধু কতকগুলো কথা বলার দ্বারাই কি তারা বিপ্লব করতে পারবে? নাকি, বিপ্লবের জন্য বা সমাজ পরিবর্তনের জন্য সমাজ অভ্যন্তরে সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি যে মানসিক পরিবর্তন আগে ঘটাতে হয়, যাকে আমরা সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলি তার পরিপূরক মানসিক ধাঁচা সৃষ্টি করতে তা সক্ষম হবে? লেনিন বলেছেন, সোস্যালিজম কামস ফ্রম উইদাউট। এর মানে হচ্ছে, এটা নিছক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উইদিন বা ভিতর থেকে আসে না। আউটসাইড অর্থাৎ বাইরে থেকে সর্বহারাশ্রেণির দলকে সোস্যালিজমের আদর্শ শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে নিয়ে যেতে হয়। বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যতক্ষণ শ্রমিক বিপ্লবী সংস্কৃতির হদিশ না পায়, অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণির পার্টি যতক্ষণ সংস্কৃতিগত আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিকের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতি না নিয়ে যায়, ততক্ষণ শ্রমিকের মধ্যে থাকে কী? ততক্ষণ শ্রমিকের মধ্যে থাকে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কুসংস্কার, না হয় মধ্যবিত্ত সমাজের ভাববিলাসিতা, আর না হয় 'ভালগার ইন্ডিভিজুয়ালিজম'। এদেশে বামপন্থী বলে পরিচিতদের আচার আচরণ দেখলে মনে হয়, সর্বহারা সংস্কৃতি অর্জনের জন্য তাদের আলাদা করে সংগ্রাম করার দরকার নেই। তা যেন আকাশ থেকে পড়বে। না, লেনিন বলছেন, সর্বযুগে ইতিহাসের বিকাশের প্রত্যেকটি বিশেষ স্তরে যেসব মনীষীরা যেসব ভাবনা-ধারণা, যেসব আদর্শ, যেসব নীতির ভিত্তিতে লড়াই করে সমাজকে তাঁদের সময়ে এগোতে সাহায্য করে গিয়েছেন, আমরা কমিউনিস্টরা যারা সর্বহারা সংস্কৃতির কথা বলি, তারা সেই সমস্ত মনীষীদের এবং সেই সমস্ত আদর্শের উত্তরাধিকারী। ফলে, কমিউনিজম আকাশ থেকে পড়েনি। অতীতের সমস্ত আদর্শের বিকাশের কনটিনিউয়িটির ধারায় কমিউনিজমের আবির্ভাব। কাজেই কমিউনিস্ট আদর্শবাদীরা অতীতের সমস্ত আদর্শের বিকাশের সাথে তাদের কনটিনিউয়িটি অনুভব করে। আবার সাথে সাথে তারা এও জানে যে, প্রত্যেকটি আদর্শ যেহেতু ইতিহাসের সীমার দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাই প্রত্যেকটি বিশেষ আদর্শের কাঠামোর সাথে অপর একটি বিশেষ আদর্শের বিরোধও বর্তমান।

তদানীন্তন সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা শরৎসাহিত্যের গুণমুগ্ধ ছিলেন

এবার আমি শরৎচন্দ্রের সমালোচকদের প্রসঙ্গে কিছু কথা বলব। এঁদের মধ্যে

একদল বলছেন, তত্ত্বের প্রতিফলন বা উন্নত চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন শরৎসাহিত্যের মধ্য দিয়ে হয়নি। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, তিনি খুব সুন্দর গল্পলেখক ছিলেন এবং তাঁর ভিতরে হৃদয়াবেগ, দরদ ও মমত্ববোধও খুব বেশি ছিল। কিন্তু, তাঁর লেখায় মননশীলতা বা 'ইন্টেলেক্ট'-এর তেমন প্রকাশ পাওয়া যায় না। যাঁরা এই সমস্ত কথা বলছেন, তাঁরা শরৎসাহিত্য কী পড়েছেন এবং কতটুকু বুঝেছেন আমি জানি না। আমি তাঁদের অন্তত একবার ভেবে দেখতে বলি, তদানীন্তন সময়ে শরৎচন্দ্রের 'অ্যাডমায়ারার' কারা ছিলেন? তখন যাঁরা শরৎচন্দ্রের অ্যাডমায়ারার ছিলেন, তাঁরা কি সব 'পাকশালার লোক' ছিলেন? সেইসময় শরৎচন্দ্রের অ্যাডমায়ারার ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ বাংলার বিপ্লবীরা। এঁরাই ছিলেন শরৎচন্দ্রের আসরের লোক, তাঁর আপনার লোক এবং এক অর্থে তিনি এঁদের অনেকের গুরু এবং পরামর্শদাতাও ছিলেন। শরৎচন্দ্রের আদর্শ, পথ এবং মূল্যবোধের কাছে এঁরা ছিলেন ঋণি। তাঁরা ছিলেন সব শরৎসাহিত্যের রসগ্রাহী বড় মানুষ। সুভাষচন্দ্র তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র ছিলেন, তিনি শরৎচন্দ্রকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। তাছাড়া আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বন্ধু ছিলেন। বিজ্ঞানী সত্যেন বোস, মেঘনাদ সাহা, ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় — এঁরা সকলেই শরৎসাহিত্যের গভীর অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করলেও তাঁর জীবদ্দশাতেই ভারতবর্ষের প্রায় সব ভাষাতেই তাঁর সাহিত্যের অনুবাদ হয়েছিল এবং তাতে পাঠকদের মধ্যে এমন অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল যে বহু প্রদেশের অন্য ভাষাভাষী মানুষ বিশ্বাস করত যে শরৎচন্দ্র তাদের প্রদেশের সাহিত্যিক। এভাবে তাঁর সাহিত্য প্রদেশ ও ভাষার সীমা অতিক্রম করে সকল ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছিল। এমন বিস্ময়কর ঘটনা শুধু এদেশে কেন, বিশ্বের অন্য কোথাও ঘটেছে কি না আমার জানা নেই। পুরনো দিনের বিপ্লবীদের কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাহলে দেখবেন আজও শরৎচন্দ্রের প্রসঙ্গ উঠলে তাঁদের চোখ ছলছল করে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এমনি তাঁদের আবেগ এবং অনুভূতি। অথচ, এই মানুষকেই একজন সাহিত্য সমালোচক বলে বসলেন 'পাকশালার সাহিত্যিক'। তাঁদের মতে বোধহয় তাহলে যে চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পাল, নেতাজি সুভাষ এবং বাংলার বিপ্লবীদের কাছে শরৎসাহিত্যের মহা কদর ছিল এবং যাঁরা শরৎচন্দ্রকে অনেক বড় বলে মনে করতেন, যার বহু কাহিনী আজও ছড়িয়ে আছে, তাঁরা সকলেই তাঁদের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত(!) ছিলেন না বা লেখাপড়া জানতেন না, বা তাঁরা ছিলেন সব মূর্খ, চাষাভূষা এবং রান্নাঘরের হাতা নাড়ার লোক। তাদের বক্তব্যের এছাড়া আর কী মানে হতে পারে আমি জানি না। আজকাল শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই ধরনের সমালোচনাই স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা পড়ছে। বিদ্যাদিগ্‌গজ না হয়ে কি

তাদের উপায় আছে!

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও তাঁরা একে অপরের প্রতি কতটা গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন দেখুন। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে বলেছিলেন, "আজ শরৎচন্দ্রের অভিনন্দনে বিশেষ গর্ব অনুভব করতে পারতুম যদি তাকে বলতে পারতুম তিনি একান্ত আমারি আবিষ্কার। কিন্তু তিনি কারও স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্রের জন্য অপেক্ষা করেননি। তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন। সাহিত্যে উপদেষ্টার চেয়ে স্রষ্টার আসন অনেক উচ্চে। আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা, সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে তিনি শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে।" তিনি আরও বলেছেন, "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন বাঙালি যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশি হয়েছে, এমন আর কারও লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেক প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সার্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি! অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।" শুধু তাই নয়, দেখুন তিনি আরও বলছেন, "শরৎচন্দ্র তাঁর গল্পে যে রসকে নিবিড় করে যুগিয়েছেন, সে হচ্ছে সুপরিচয়ের রস। ... তিনি নিজে দেখেছেন বিস্তৃত করে, দেখিয়েছেন তেমনি সুগোচর করে।" আরেক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তাঁর জীবদ্দশাতেই সাহিত্যের তৃতীয় পর্বের আরম্ভ হয়েছে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে। আধুনিকের সঙ্গে তার যেমন নৈকট্য ঘটেছে, তাঁর পূর্ববর্তীকালের আর কারও তেমন ঘটেনি। তিনি সম্পূর্ণভাবেই নিজের দেশের ও কালের। এটা সহজ কথা নয়।" আবার তিনি একথাও বলেছেন, "আধুনিক লেখকরা শরৎচন্দ্রের পথেরই অনুসারী। ... একদিন তারা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশা করি পাঠকেরা ভুলবে না।" নিষ্কৃতি উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় তিনি এমনও লিখেছেন যে, শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের প্রথম সারিতে নিয়ে গেছেন। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন। শরৎচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পথিকৃৎ হিসাবে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। ১৩৩৮ (বাংলা) সনে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সংবর্ধনা সভায় প্রথম যৌবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নতুন আলো যেন চোখে এসে পড়ল। সেদিনের সেই গভীর সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না। ... ঐ তো খানকয়েক পাতা। তার মধ্য দিয়ে যিনি এতবড় সম্পদ সেদিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায়?" এমনকি ঢাকায় একদল ছাত্র

যখন তাঁকে বলে, 'আমরা আপনার লেখা বুঝি ও পছন্দ করি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লেখা বুঝতে পারি না'। শরৎচন্দ্র অসন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য, আর আমি লিখি তোমাদের জন্য।" একমাত্র গুণীই গুণীর মর্যাদা বোঝেন। এরপরে শরৎচন্দ্রের সমালোচকরা কী বলবেন?

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে দেশবন্ধুর গভীর শ্রদ্ধা

একটা ঘটনা আপনাদের বলি, যেটা তখনকার বিপ্লবীরা যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে শোনা। নেশা ছাড়ার ক্ষেত্রে 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে জীবানন্দের মধ্যে আমরা যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পাই, সেটা অনেকটা যেন তাঁর নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি। শরৎচন্দ্র নিজে প্রচণ্ড আফিম খেতেন এবং আফিমে তিনি এমন আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, আফিম না খেলে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। এমন অবস্থা তাঁর হয়ে গিয়েছিল। দেশবন্ধু যখন মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন শুরু করেন এবং দেশের ছেলেরা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাদকদ্রব্যের দোকানের সামনে পিকেট করতে শুরু করে, তখন শরৎচন্দ্র আফিম খাওয়া ছেড়ে দিলেন। আর ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার, আত্মীয়স্বজন এমনকি সুভাষচন্দ্র থেকে শুরু করে বাংলার বিপ্লবীরা তাঁকে আফিম খাওয়ার জন্য অনুরোধ করে করে হন্যে হয়ে পড়েছেন। তিনি শুধু একটা জবাব দিয়ে গেছেন, না। তারা বলছে আফিম না খেলে আপনি মারা যাবেন। তিনি সেখানে রস করে বলছেন, যেটা 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে জীবানন্দের কাহিনীতে আমরা পাই যে, দেখ বাপু, আমি চিরকাল ফেল করেছি, কিন্তু আমার এই হার্ট কোনওদিন ফেল করেনি। এবারে হার্ট যদি ফেল করে করুক, আমি কিছুতেই ফেল করব না। অর্থাৎ তিনি বলছেন দেশের ছেলেরা ওখানে লড়ছে, আর আমি আমার জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আফিম খাব? তা হবে না, তাতে আমার হার্ট ফেল করে করুক। আমি মরে গেলেও আফিম খাব না। এমনি ছিল তাঁর জেদ। অবশেষে দেশবন্ধু নিজে তাঁর কাছে গিয়ে আফিম খাওয়ার জন্য তাঁকে চাপ দেন এবং একধরনের ধমকই দেন তাঁকে। তিনি শরৎচন্দ্রকে বলেন, দেখুন, আপনি যে আন্দোলনের জন্য এই আফিম খাচ্ছেন না, আপনি যদি আমাদের কথা না শোনেন, তাহলে আমি সেই মাদকদ্রব্য বর্জনের আন্দোলনই তুলে নেব বিনা শর্তে। এ ব্যাপারে চিত্তরঞ্জন দাশের একটা বিখ্যাত উক্তিই আছে যেটা অনেকে আবার প্রকাশও করেছেন, তা হচ্ছে 'আই ক্যান অ্যাফর্ড টু উইথড্র দ্য মুভমেন্ট আনকন্ডিশনালি, বাট আই ক্যানট অ্যাফর্ড টু লুজ শরৎচন্দ্র', অর্থাৎ যদি মাদকদ্রব্য বর্জন আন্দোলন আমায় তুলে নিতে হয়, আমি তাও বিনাশর্তে তুলে নেব, কিন্তু শরৎচন্দ্রকে হারানো আমাদের চলবে না। এরপর শরৎচন্দ্রকে তিনি বলছেন, আন্দোলনের স্বার্থ যদি আপনি চান, তাহলে সেই আন্দোলনের স্বার্থেই

আপনাকে আফিম খেতে হবে। না হলে আপনি জানেন, আমি মিথ্যা কথা বলার পাত্র নই, আমি আন্দোলনই তুলে নেব। দেশবন্ধু তাঁকে এইভাবে বলার পরই শরৎচন্দ্র আবার আফিম খান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শরৎচন্দ্রের প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা ও আবেগ ছিল!

গান্ধিজির বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ

আর মানুষ হিসাবে শরৎচন্দ্র কেমন বলিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা ছিলেন, শুধু দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করে আমি বিষয়টিকে আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করব। বাংলাদেশে যখন সশস্ত্র আন্দোলন প্রবল বেগে চলছে, সেই সময়ে গান্ধিজি একবার চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়িতে এসেছিলেন। গান্ধিজি তখন সর্বত্র বক্তৃতায়-লেখায় এই বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে তুফান তুলছেন এবং বহু বিদ্রূপ মন্তব্য করছেন, যার জন্য বাংলার বিপ্লবীরা, এমনকি চিত্তরঞ্জন দাশ সহ বহু লোকই গান্ধিজির ওপর ক্ষুব্ধ। গান্ধিজির প্রতি তাদের ক্ষোভ এজন্য ছিল না যে, গান্ধিজির মহত্ত্ব বা স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্বকে তাঁরা অস্বীকার করতেন, তবে বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে গান্ধিজির এই সমস্ত বিদ্রূপ মন্তব্যকে তাঁরা পছন্দ করতেন না। সেই আসরে বিপিন পালও উপস্থিত ছিলেন। তৎকালীন স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জনমানসে বিপিন পালের আসন কোথায় ছিল, তা আজকালকার লোকেরা বুঝতে পারবেন না। গোটা ভারতবর্ষে তখন লোকের মুখে মুখে লাল-বাল-পাল বলে একটা কথা চালু ছিল। এঁরা ছিলেন ভারতের তিন দিকপাল — লালা লাজপত রাই, বাল গঙ্গাধর তিলক, আর বিপিনচন্দ্র পাল। মহাবাগ্মী এই বিপিনচন্দ্র পালকে বাংলার বিপ্লববাদের অন্যতম গুরু বলা হয়। ব্যক্তিত্বের এইরকম মূর্ত প্রতীক ছিলেন বিপিন পাল। আর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কত বড় নেতা ছিলেন এবং জনগণের মধ্যে তাঁর আসন কত উচ্চে ছিল, তা আজকাল যারা জনগণের নেতা, তাদের দেখে হদিশ পাওয়ার কোনও উপায় নেই। সুভাষচন্দ্র তখন যুবক, তুলনামূলকভাবে এঁদের থেকে বয়স অল্প, তিনিও সেই বৈঠকে উপস্থিত। বৈঠকে আলোচনার মধ্যে বিপ্লবীদের কথা উঠলে গান্ধিজি বললেন, এই বিপ্লবীরা দেশের শত্রু। এদের কোনও রকম সমর্থন কংগ্রেস থেকে করা চলবে না। এমন উক্তি শুনে ক্ষোভে-ব্যথায় চিত্তরঞ্জন দাশ মাথা নিচু করে বসে আছেন। কারণ, বাংলার বিপ্লবীদের তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন। বাংলার বিপ্লববাদের যিনি গুরু সেই বিপিন পাল মাথা নিচু করে বসে আছেন। সুভাষ বোসও মাথা নিচু করে বসে আছেন। অন্যান্য আরও যাঁরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাও সব মাথা নিচু করে বসে আছেন। কেউই এটা মানতে পারছেন না, কিন্তু গান্ধিজির মুখের ওপর কথা বলবেন এটাও তাঁরা পারছিলেন না। শরৎচন্দ্রও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তখন উঠে দাঁড়িয়ে গান্ধিজিকে বললেন, আমি আপনার এই

উক্তির প্রতিবাদ করছি। আপনার এই উক্তি প্রত্যাহার করতে হবে। তাঁদের সঙ্গে আপনার মতের এবং পথের মিল না হতে পারে। কিন্তু, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে, গোটা ভারতবর্ষের মুক্তি এবং স্বাধীনতার জন্যই এঁরা নিজেদের গলা ফাঁসিকাঠে বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আপনি তাঁদের পথ নিয়ে সমালোচনা করতে পারেন, কিন্তু দেশের প্রতি তাঁদের ভালবাসা এবং মমত্ববোধ সম্পর্কে সন্দেহ করা কোনও মতেই চলবে না। দেশের জন্য যাঁরা এইভাবে ফাঁসিকাঠে ঝুলছেন, তাঁদের দেশের শত্রু বলার মতো অন্যায় আর কিছু হতে পারে না। আর, তাঁদের সঙ্গে আপনার মতবিরোধ রয়েছে বলেই আপনি যদি তাঁদের দেশের শত্রু বলেন, তাহলে আপনার সঙ্গেও তো তাঁদের মতবিরোধ রয়েছে — এই একই যুক্তিতে তাঁরাও তো আপনাকে দেশের শত্রু বলতে পারেন। শরৎচন্দ্রের এই বক্তব্যে সকলের মধ্যে তখন আবেগ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিন পালের মুখে চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে। সুভাষ বোসের চোখ উত্তেজনায় ছলছল করছে। গান্ধিজি অবস্থা দেখে বিচলিত হলেন। তাছাড়া তিনিও তো বড়মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং তাঁর এই উক্তি শুধু প্রত্যাহার করলেন না, তার জন্য ক্ষমাও চাইলেন। মানুষ হিসাবে শরৎচন্দ্র ছিলেন এইরকম দৃঢ়চেতা। দেখুন, গান্ধিজির এতবড় একটা অন্যায় উক্তি যেখানে সকলেই মানতে না পারলেও চুপ করেছিলেন, সেখানে শরৎচন্দ্রের ন্যায়নীতিবোধ এমন একটা উঁচু পর্দায় বাঁধা ছিল যে, যে গান্ধিজিকে তিনিও শ্রদ্ধা করতেন, সেই গান্ধিজির মুখের ওপর তীব্র প্রতিবাদ করতে তাঁর বাধেনি। আরেকবার শরৎচন্দ্রকে চরকা কাটতে দেখে গান্ধিজি প্রশ্ন করেন, 'শরৎবাবু, আপনি তো চরকায় বিশ্বাস করেন না, তবে এত ভাল করে সূতো কাটছেন কী করে?' শরৎচন্দ্র নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, 'আমি একজন কংগ্রেস সদস্য হিসাবে ডিসিপ্লিন মেনে চরকা কাটছি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি অ্যাটেইনমেন্ট অফ স্বরাজ ক্যান ওনলি বি ডান বাই সোলজারস, নট বাই স্পাইডার্স।' অর্থাৎ মাকড়সারা স্বরাজ অর্জন করতে পারে না, একমাত্র যোদ্ধারাই পারে। মার্কসবাদী না হয়েও কী অসাধারণ বিচারশক্তির পরিচয় দিয়ে সেইযুগে তিনি এটাও বলেছিলেন, "তাঁর (গান্ধিজির) আসল ভয় সমাজতন্ত্রকে। তাঁকে ঘিরে রয়েছে ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কীভাবে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।"

স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে শরৎচন্দ্র ছিলেন বিপ্লবী ধারার মূর্ত প্রতীক

দেশের পরাধীনতার বেদনা শরৎচন্দ্রের মনে এত গভীর ছিল যে, তিনি শুধু সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করে থাকতে পারেননি। বারবার সাহিত্য ছেড়ে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে এসে পড়েছেন। স্বাধীনতার আকাঙক্ষায়, জাতীয় মর্যাদার প্রতি

ভালবাসায় এবং জাত্যভিমানে প্রবলভাবে টগবগ করতেন ওই মানুষটা। টগবগ করতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা আন্দোলনে সমস্ত জাতির দুঃখ-বেদনার তিনি মূর্ত প্রতীক ছিলেন। ১৯২৭ সালে বাংলার বিপ্লবীরা জেল থেকে যখন বেরিয়ে এল, গান্ধিবাদী জাতীয় কংগ্রেস তাদের একটা সংবর্ধনা পর্যন্ত দিল না। কিন্তু, স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা না হয়েও হাওড়া জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শরৎচন্দ্রই হাওড়া টাউন হলে প্রথম তাদের সংবর্ধনার বন্দোবস্ত করলেন। গান্ধিবাদীদের মতামতের অপেক্ষায় তিনি বসে রইলেন না। ভিতরে ভিতরে অনেক কংগ্রেসি নেতাই তখন বিপ্লবীদের তারিফ করতেন, কিন্তু কোনও কংগ্রেসি নেতারই সাহস ছিল না কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গিয়ে বন্দিদের সংবর্ধনা দেওয়ার। কিন্তু, শরৎচন্দ্রের সে সাহস ছিল এবং তিনিই প্রথম এটা শুরু করলেন। দেখুন, আজ যে বিপ্লবীদের নিয়ে এত গল্প-কাহিনী, কংগ্রেসের মনোভাবের জন্য সেই বিপ্লবীদের কিন্তু তখন ডাকাত, খুনি বলে মনে করা হত এবং তাদের প্রতি আচরণও হত সেই ধরনের। কিন্তু, শরৎচন্দ্র প্রথম বন্দিদের সংবর্ধনা দেওয়ার পরই সারা দেশে বিপ্লবীদের সংবর্ধনার বন্যা বইতে শুরু করল, বিপ্লবীদের প্রশংসা হতে শুরু হল। আবার এই বিপ্লবীরা সেইসময়ে ভাবেনি এমন দুইটি মূল্যবান শিক্ষাও তিনি দিয়েছেন। সেই সময়ে একমাত্র ভগৎ সিংরা ছাড়া প্রায় সব বিপ্লবীই ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। শরৎচন্দ্র নানা পুস্তকে নানাভাবে ধর্মীয় চিন্তার বিরুদ্ধে পার্থিব মানবতাবাদের সপক্ষে যেমন লিখেছেন, অন্যদিকে পথের দাবীতে সরাসরি বলেছেন, "সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় শত্রু আর নেই।" আমাদের দেশের পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদীদের মধ্যেও সেদিন এই চিন্তা অকল্পনীয় ছিল। তাছাড়া সেই যুগে গান্ধিবাদী আপসকামীরাই শুধু নন, বিপ্লবীরাও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা ভাবেননি। শরৎচন্দ্র তাঁদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পথের দাবীতে শশী কবির উদ্দেশে সব্যসাচীকে দিয়ে বলেছেন, "তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন, — ধর্ম, সমাজ, সংস্কার, — সমস্ত ভেঙে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক।" তাই দেখা যায় যে তদানীন্তন পুরনো সমাজের কর্তাদের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি আঘাত এসেছে শরৎচন্দ্রের ওপরে। গোঁড়া হিন্দুসমাজ শরৎচিন্তার বিরোধী ছিল। অথচ তৎকালীন সময়ে হিন্দুসমাজের কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মরাও কম কথা বলেননি। কিন্তু গোঁড়া হিন্দুসমাজ তাতে ভ্রূক্ষেপও করেনি, বা তাঁদের প্রভাবান্বিত সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অত বিষোদ্‌গারও করেনি। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, সমাজের মাটিটা ওইসব সাহিত্যিকরা স্পর্শ করতে পারেননি। বাংলার সমাজের মাটিকে স্পর্শ করে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন করার জন্য যে সাহিত্য হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে কাজ করেছে এবং তার পুরনো আচার, রীতিনীতিগুলোর

বিরুদ্ধে কাজ করেছে — সে হচ্ছে শরৎসাহিত্য এবং শরৎচিন্তা। আরেক জায়গায় ছাত্র-যুব সমাবেশে শরৎচন্দ্র বলেছেন, "বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা — এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।" তখনকার বয়সে এইসব কথার গুরুত্ব না বুঝলেও এই শরৎচন্দ্রের শিক্ষাতেই আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি। আমাদের প্রথম জীবনে বার-তের বছর বয়সে আমরা বোমা পিস্তলের দলে ঢুকে গিয়েছিলাম শরৎসাহিত্য পড়ে। শরৎচন্দ্র নিছক একটা গল্প বা দুটো দরদের কথা আমাদের শোনাননি। তাঁর বই পড়তে পড়তে সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে আমরা সচেতন হয়ে গেছি। তাঁর সাহিত্য দেশের যুবকদের দলে দলে এইভাবে সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করেছে, তাদের পাল্টে দিয়েছে। তিনি তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে এই কথাটাই বারবার বলতে চেয়েছেন, তোমরা যদি মানুষ হও, তাহলে এই অন্যায়ের প্রতিবিধান তোমাদের করতে হবে।

শরৎসাহিত্য সম্পর্কে শাসকশ্রেণির পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

আপনারা দেখেছেন, বর্তমান শাসকবর্গ তাদের পছন্দমতো স্বাধীনতা যুগের নেতৃবৃন্দের পাবলিসিটি দেয়। অথচ যে শরৎচন্দ্র স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগের বিপ্লবী ধারা এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে এমন গৌরবজনকভাবে মিশে আছেন, সেই শরৎসাহিত্যকে সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করে না। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাদের যেন স্বভাবজাত একটা অনীহা ভিতর থেকে কাজ করছে। তাদের কেউ কেউ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কখনও কিছু বলতে হয় তাই বলছেন, সম্মান দেখাতে হয় তাই দেখাচ্ছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র নিয়ে চর্চা করা বা তাঁর মূল্যায়ন যত কম হয়, এর গুরুত্ব যত কমে, তাই তাঁরা চান। এই তাঁদের মানসিকতা। এমনকি তাঁর কিছু কিছু বই ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হচ্ছে এটাও দেখা যাচ্ছে। তাঁর 'চরিত্রহীন' বইখানা সম্প্রতি আবার পড়তে গিয়ে দেখলাম যে, তার মূল কপিতে যে ডায়ালগ ছিল, সর্বশেষ প্রকাশিত কপিতে সেই ডায়ালগের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। যে ডায়ালগ-এর জন্য তিনি বিখ্যাত, তাঁর সেই ডায়ালগের পর ডায়ালগ উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের খুশিমতো কতগুলো শব্দ সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফল দাঁড়াল, নতুন পাঠক সম্প্রদায় তাঁর বই পড়ে তাঁর সাহিত্যের রসমাধুর্য ধরতে পারবেন না, কত বড় সাহিত্যিক তিনি ছিলেন, তা বুঝতে পারবেন না। তাঁর বাক্য বিন্যাস ও ডায়ালগের মধ্যে যে কী সৌন্দর্য ও রস লুক্কায়িত আছে, যেগুলো তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত চিন্তা-ভাবনাগুলো ও সূক্ষ্ম মূল্যবোধগুলোকে বুদ্ধি দিয়ে বোঝার আগেই মানুষের মনে ধাক্কা দিয়ে তার উপলব্ধি ঘটায়— সেগুলো আজকালকার ছেলেমেয়েরা

বুঝতেই পারবে না। এইগুলোকে কি শুধু ভুল বলে ব্যাখ্যা করা যায়? একে তো তাঁর বইগুলি ছাপার ভুলে ভর্তি। সেগুলো নাহয় ভুল বলে ধরতে পারি। কিন্তু, জায়গা মতন এই যে ডায়ালগ পাল্টানো— একে কি আমরা ভুল বলে গ্রহণ করতে পারি? অন্তত আমি পারি না, এটা অসম্ভব। অন্যদের ক্ষেত্রে হচ্ছে না; শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে হচ্ছে কেন? কেন এই সব লোক শরৎচন্দ্রের বিরাট কর্মকাণ্ড এবং জীবনযাত্রার মধ্যে সম্পদের খোঁজ না করে শুধু ত্রুটি বের করার চেষ্টা করে? এই মানসিকতা কেন? কারণ, যেমন ইংরেজ শাসকেরা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ভীত ছিল, তেমনি বর্তমান শাসক সম্প্রদায়ও ভীত। তারা জানে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন ও চর্চা হলে শাসক সম্প্রদায়ের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে। শুধু তাই নয়, শরৎচন্দ্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে থাকলে বামপন্থী আন্দোলনে যে নৈতিক অধঃপতন আজ ঘটছে, সেই নৈতিকতাও একটা নতুন ভিত্তি খুঁজে পাবে। সেই আন্দোলনের মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে। আধুনিক সংস্কৃতির ধ্যানধারণার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে। মানুষ সর্বহারা সংস্কৃতির আন্দোলন গড়ে তোলার যথার্থ পথ খুঁজে পাবে। কারণ, শরৎ-সংস্কৃতির কনটিনিউটিতেই এদেশে সর্বহারা সংস্কৃতি আসবে। কাজেই তাদের চেষ্টা হচ্ছে শরৎ-সংস্কৃতির ভিত যদি নষ্ট করে দেওয়া যায়, তাহলে সর্বহারা সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারবে না, অথবা সর্বহারা সংস্কৃতির নামে যা হবে, তা বুর্জোয়া সমাজের মূলে আঘাত করতে পারবে না। একথা বুঝলেই বোঝা যাবে, কেন শাসক বুর্জোয়ারা, মেকি বামপন্থীরা যারা শুধু স্লোগান-সর্বস্ব রাজনীতিতে আসর জমিয়ে রেখেছে, কেন তারা এত শরৎবিরোধী এবং শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রচার করতে চায়। এটাও প্রমাণ করে যে, শরৎসাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নের মধ্যেই রয়েছে সর্বহারা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ। আর, তারই ভয়ে তারা শরৎ সাহিত্যকে প্রায় বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, নানা অপপ্রচার করছে যাতে এর প্রতি পাঠকদের আকর্ষণ কমে যায়। এটাই এদের ষড়যন্ত্র। মনে রাখবেন, প্রতিটি উন্নততর চিন্তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে শুধু বিদেশের বড় বড় সংস্কৃতিবানদের নকল করে আর তার দ্বারা মনমতন কতকগুলো গল্প তৈরি করে তাদের নায়ক-নায়িকাদের মুখ দিয়ে কিছু মার্কসবাদের পণ্ডিতদের কোটেশন বলিয়ে বলিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতি হবে না। সর্বহারা সংস্কৃতির মূল মর্মবস্তু হচ্ছে উন্নত রুচি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ। সেই মূল্যবোধকে অতীতের মূল্যবোধের ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে হবে। শরৎসাহিত্য বর্জন করলে তার জমি কোথায়? তাই শরৎসাহিত্যের ঠিক ঠিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার।

একটা কথা আমি এখানে আপনাদের বলতে চাই। তা হচ্ছে আগেও শরৎচন্দ্রের স্বীকৃতি এদেশে কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা হয়নি। তখনকার সমাজের যারা সুবিধাবাদী শ্রেণির, যারা হোমরাচোমরা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা তিনি

পাননি। সাধারণ মানুষের মন থেকে তাঁকে মুছে ফেলার জন্য কোথাও কায়েমি স্বার্থবাদীদের বিরোধিতা তাঁর প্রতি হয়েছে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও হয়েছে অতি সূক্ষ্মভাবে — অত্যন্ত নিম্নস্তরের নোংরামির মতো। কিন্তু এদের সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি কলমের জোরে, তাঁর স্বকীয় ক্ষমতার জোরে সাধারণ মানুষের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র উচ্চস্তরের তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন

একদল বলে থাকেন, শরৎসাহিত্যের পিছনে নাকি কোনও তত্ত্ব এবং সুচিন্তিত কোনও জীবনদর্শন নেই। বিদগ্ধ বলে পরিচিত একজন ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের সমালোচনা করতে গিয়ে অদ্ভুত আর একটা কথাও বলেছেন। আমি তো বুঝতেই পারি না, কী ধরনের মানসিকতা থেকে এসব সমালোচনা হচ্ছে? শরৎচন্দ্রের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা যখন এসব কথা বলেন, তখন তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্য একটা সন্দেহ মাঝে মাঝে আমার মনের মধ্যে এসে উঁকি দেয়। মহাবিদগ্ধ বলে পরিচিত যে ব্যক্তিটির কথা আমি বলছি, যতদূর আমি জানি তাঁর সম্বন্ধে, তিনি প্রথম জীবনে শরৎসাহিত্য পড়ারই যোগ্য মনে করেননি এবং সেজন্য পড়েননি। তিনি মনে করতেন, এসব গল্প বাড়ির বৌ-ঝিরা পড়ে, এ বিদগ্ধদের পড়ার জিনিস নয়। পরে তিনি শরৎসাহিত্য পড়তে শুরু করেন এবং যেহেতু তিনি পণ্ডিত লোক, তাই পড়তে গিয়ে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর পুরনো উপলব্ধি খানিকটা পাল্টায়। তবুও দেখুন, চিন্তার ক্ষেত্রে কোথায় তাঁর জট পাকিয়ে আছে। তিনি বলছেন, শরৎচন্দ্র ছিলেন রসস্রষ্টা এবং জীবনদ্রষ্টা, কিন্তু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী এবং তত্ত্বব্যাখ্যানী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীনতার জ্বলন্ত মূর্ত প্রতীক। তাঁর প্রথম কথাটা যদি আমি বিশ্লেষণ করি, তাহলে তার কথা অনুযায়ী দাঁড়ায়, শরৎচন্দ্র ছিলেন জীবনদ্রষ্টা — অর্থাৎ, যে অন্তর্নিহিত নিয়মগুলো জীবনকে পরিচালনা করে, শরৎচন্দ্র তা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তার সমস্যাগুলোকে অনুভব করতে পেরেছিলেন, আর তিনি ছিলেন রসগ্রাহী। কিন্তু, তিনি তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না। আমি তো বুঝতেই পারি না, একজন যদি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী না হয়, অর্থাৎ সেই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোন্নত তত্ত্বের অধিকারী না হয়, তাহলে সে জীবনদ্রষ্টা হয় কী করে সেই সময়ে এবং রসস্রষ্টাই বা হয় কী করে? তাহলে তার কথার দ্বারা কি এটাই ধরে নিতে হবে যে, জীবনকে দেখার জন্য, তার সমস্যা বোঝার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের দরকার নেই? আর, যিনি তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করেন, সেই মহাব্যক্তি জীবন থেকে বহুদূরে এবং তিনি জীবনের সমস্যা কিছুই বোঝেন না? অথচ, যিনি মহাজ্ঞানী তিনিই তো মহারসিক, তিনিই তো যথার্থ রসসৃষ্টি করতে সক্ষম। জ্ঞান তো রসের সঙ্গেই মিশ্রিত। এ কথাটা দর্শনের ক্ষেত্রেও যেমন সত্য, সর্বশাস্ত্রেও তাই। জ্ঞান কী? 'সেনসেশন টু পারসেপশন

অ্যান্ড টু কনসেপশন লিডিং টু ইমোশন’, অর্থাৎ ‘নলেজ টু এগেইন ইমোশন’। আমরা জানি, পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান আলাদা জিনিস। জীবন সংগ্রামের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত যে তত্ত্বজ্ঞান, তা নিছক পাণ্ডিত্য মাত্র, তা জ্ঞান নয়।

এইসব তথাকথিত সমালোচকদের বলতে শুনি, শরৎচন্দ্র খুব বড় কথাশিল্পী এবং খুব দরদি ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানের বা তত্ত্বের বড় কোনও কথা তাঁর সাহিত্যে নেই। আমি আগেই আপনাদের বলেছি দরদি হতে হলে, সত্যিকারের দরদি হতে গেলে সত্যিকারের জ্ঞানী হতে হয়। যে যুগে যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, সে যুগের সে শ্রেষ্ঠ জনদরদি। আর সব জ্ঞানীরা হচ্ছেন মেকি। তারা শুধু কথা সাজায়, কিন্তু তার অর্থ যথার্থ বোঝে না। তাহলে তারা কি সত্যিকারের জ্ঞানী? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জ্ঞান আর পাণ্ডিত্য দুটো আলাদা জিনিস। তিনি এই দুটোর পার্থক্য নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। কারণ, জীবন দিয়ে তিনি তা বুঝেছেন। একদল লোক আছেন, যাঁরা না পড়েছেন এমন জিনিস নেই, না উদ্ধৃতি দিতে পারেন এমন কথা নেই, কিন্তু প্রাণ দিয়ে তাঁরা কিছু উপলব্ধি করেন না। যিনি বলছেন, শরৎচন্দ্র জীবনদ্রষ্টা ছিলেন, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন না - আমি বলি, হ্যাঁ, ওরকম তত্ত্বজ্ঞানে জনতারও দরকার নেই। একথা ঠিক যে শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প উপন্যাসে সাধারণ মানুষের বুদ্ধির অগম্য বড় বড় কথা বলেননি। তাই একটা কথা আমার বারবার মনে হয়েছে, যাঁরা সাহিত্যের মধ্যে শুধু বড় কথা খুঁজতে যান এবং তারই মাপকাঠিতে সাহিত্যের মূল্য বিচার করেন, তাঁরা সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে অযোগ্য পাত্র।

যাঁরা বলছেন, শরৎচন্দ্র তত্ত্বজ্ঞানী নন, তাঁদের কথা একেবারেই ঠিক নয়। কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, আপনারা বিচার করে দেখুন। যেমন ছাত্র-যুবকদের একটি সভায় তিনি বলেছেন, “সত্যের কোনও শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ বা রিলেশন দিয়ে সত্যের যাচাই হয়। দেশ কাল পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধে সত্য জ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনকে বুদ্ধিপূর্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা।” পথের দাবীতে একজায়গায় সব্যসাচীর মুখ দিয়ে তিনি বলছেন, “এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্য উপলব্ধি বলিয়া কোনও নিত্য বস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। যুগে যুগে, কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে — এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।” এটাই আরেক জায়গায় বলছেন, “তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য, — এই অর্থহীন নিস্ফলা শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহামূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই।। তোমরা ভাবো মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয় — এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি

প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।" সেই যুগে শাশ্বত সত্য বিশ্বাসের ভ্রান্ত ধারণার থেকে ছাত্র-যুবকদের মুক্ত করার জন্য কত সহজ ভাষায় তিনি কী কঠিন তত্ত্বকে উপস্থিত করেছেন। আরেকটি বিষয় পথের দাবী উপন্যাসে সব্যসাচীর মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন, "হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে দিলে এতবড় শত্রু আর নেই।" অর্থাৎ স্নেহ-মমতা-প্রেম-ভালবাসা খুবই মূল্যবান। কিন্তু এর প্রভাবে যদি বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে যায়, মানুষ দুর্বল হয়ে ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্যবোধ হারিয়ে ফেলে, তাহলে এটা শত্রুর মতোই ক্ষতি করে। এটা কতবড় মূল্যবান শিক্ষা! আরেক জায়গায় সব্যসাচী বলছেন, "শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায়, তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই।" অর্থাৎ শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক-শাসকশ্রেণি সবসময়ই তার স্বার্থে রচিত নীতিনৈতিকতাকে সমাজের স্বার্থে রচিত হিসাবে শোষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করে যেন এসব শ্রেণিস্বার্থের ঊর্ধ্বে। ফলে শোষিত জনগণও নির্বিচারে শ্রেণিশোষণ-শাসন মেনে নেয়। এর দ্বারা কতবড় মূল্যবান শিক্ষা শোষিত জনগণকে সচেতন করার জন্য তিনি বলেছেন। 'শেষ প্রশ্ন'তে নারীদের সম্পর্কে সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে যেভাবে নারীর যথার্থ মর্যাদাবোধ ও সার্থকতার পথ নির্ধারণ করেছেন, সেটা বিশ্বসাহিত্যে আর কোথাও আছে কি না আমার জানা নেই। বহু যুগ ধরে নারীদের মধ্যে এমন ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়েছে পুরুষশাসিত সমাজের স্বার্থে যে বিবাহটাই নারীজীবনের মূল লক্ষ্য ও মাতৃত্বেই তার চরম সার্থকতা। এর বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্র বলছেন, "সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা, তার বেশি নয়, এটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যেদিন মেনে নিয়েছেন, সেইদিনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি।" প্রচলিত ধারণা হচ্ছে একজন নারীর জন্মই বিবাহের জন্য, বিবাহ না হলে তার গতি নেই, মানুষ হিসাবে সমাজে কোনও করণীয় নেই। কিন্তু বিবাহ তো পুরুষেরাও করে, বিবাহ নারীর যতটা প্রয়োজন, পুরুষেরও ততটাই প্রয়োজন। কিন্তু একটু বয়স হলেই পরিবারের আত্মীয়স্বজনের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না, এখনও কন্যার বিবাহ হয়নি। কন্যাও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়, পরিবারের লাঞ্ছনা গঞ্জনার শেষ থাকে না, এতেই নারীর নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যায়। একজন স্বামী ছাড়া তার জীবন যেন অসহায় অবলম্বনহীন হয়ে যায়। কিন্তু একজন পুরুষ কি এভাবে ভাবে? আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও তিনি নারীজাতিকে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "চাটুবাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারী জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল।" এই ধারণাও বহুযুগ ধরে চলে আসছে। সন্তানের, বিশেষত পুত্র সন্তানের মা না হতে পারলে নারী জীবন ব্যর্থ। মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা। পরিবারের গঞ্জনা, অত্যাচার, নানা কুৎসিত মন্তব্য যেমন শুনতে হয়,

অন্যদিকে একজন নারীও নিজেকে ব্যর্থ মনে করে পূজা-মানত করতে থাকে, এমনকি উন্মাদ হয়ে যায়, আত্মহত্যাও করে। নানা কারণেই সন্তান না হতে পারে, স্বামীর বন্ধ্যাত্বও দায়ী হতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা একজন নারীর সার্থকতা, পুরুষের মতোই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব প্রকাশের সফলতায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে, পারিবারিক-সামাজিক জীবনের দায়িত্বপালনে। অথচ পুরুষশাসিত সমাজের বিধান রক্তে-মাংসে-মজ্জায় এমনভাবে মিশে আছে যে, এমনকি দর্শনে, বিজ্ঞানে, অর্থনীতিতে, চিকিৎসাবিদ্যায় এসব নানা ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন সত্ত্বেও সন্তানহীন একজন নারী ভাবে সে ব্যর্থ। শরৎচন্দ্র এইসব কুসংস্কার থেকে নারীজাতিকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। শরৎচন্দ্র 'শেষ প্রশ্ন'তে আশ্রমজীবনের নিস্ফলতা যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি ব্রহ্মচর্যের অসারতা ও ট্র্যাজিক পরিণতি সম্পর্কেও সতর্ক করেছেন। তিনি একজায়গায় বলেছেন, "রিপু বলে গাল দিলেই ত সে ছোট হয়ে যায় না। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার - তাদের কোন সত্ত্বাটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই ত দুঃখকে জয় করা নয়।" আরেকটা জায়গায় বলছেন, "সীমা মেনে চলাই তো সংযম, শক্তির স্পর্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্যাদা দেওয়া চলে না। অতি-সংযম যে আর এক ধরনের অসংযম।" এই বিষয়ে আধ্যাত্মিকদের সতর্ক করে দিয়ে আরও বলেছেন, "সমস্ত সংযমের মত যৌন সংযমেও সত্য আছে। কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘটা করে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য করে তুললে সে হয় আর এক ধরনের অসংযম। তার দণ্ড আছে। আত্ম-নিগ্রহের উগ্র দম্ভে অধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে।" গ্রাম্য সামাজিক জীবনে ধর্মের ভূমিকা যে অকার্যকরী হয়ে গেছে এবং মৃত এই ধর্মের চর্চা কী ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সম্পর্কে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসে বলছেন, "কোথায় সেই চরিত্র? কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে? ধর্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য সমাজ যে যথার্থ ধর্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই বিষাক্ত পূতিগন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে।" ধর্মীয় চিন্তা ও ত্যাগবাদ কীভাবে শোষিত মানুষকে বিভ্রান্ত ও আচ্ছন্ন করছে, সেটাই কত গভীর বেদনার সাথে বলেছেন, "এদেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির মত হল, মানুষের জীবন যাত্রায় প্রয়োজনের ভিত্তি কমিয়ে আনা দরকার। অভাব বোধই দুঃখ। অতএব দশ হাতের বদলে পাঁচ হাত কাপড় এবং পাঁচ হাতের বদলে কৌপীন পরিধান এবং যেহেতু বিলাসিতা পাপ সেহেতু সর্বপ্রকার কৃচ্ছসাধনই মনুষ্যত্ব বিকাশের সর্বোত্তম উপায়। এই পূণ্যভূমি ত্যাগমাহাত্ম্যে ভরপুর। উচ্চাঙ্গের দর্শনশাস্ত্রে কি আছে জানি না, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, এই ত্যাগের মন্ত্রই দিনের

পর দিন সকল সাধারণকে মানুষের ধাপ থেকে নামিয়ে পশুর কোটায় টেনে এনেছে। উচ্চাকাঙ্খা করবে কি? অভাববোধটাই তাদের শুকিয়ে গেছে। ছোট জাত, অস্পৃশ্য, তাতে কি? ভগবান করেছেন। এতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যারা আর একটু বেশি জানে তারা উদাস চক্ষে চেয়ে বলে সংসার তো মায়া! দুদিনের খেলা! এই জন্মে সন্তুষ্ট চিত্তে দুঃখ সয়ে গেলে আর জন্মে মুখ তুলে চাবেন। এক অদৃষ্ট ছাড়া আর কারো বিরুদ্ধে তাদের নালিশ নেই। চাইতে তারা জানে না, চাইতে তারা ভয় পায়। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, শক্তি নেই, স্বাস্থ্য নেই, অভাবের পর অভাব নিরন্তর যতই চেপে বসে, ততই তারা সহ্য করার বর প্রার্থনা করে। তাতেও যখন কুলায় না, তখন আকাশের পানে চেয়ে নিঃশব্দে চোখ বোজে।'' বহুদিন আগে শরৎচন্দ্র এই কথাও বলেছেন, ''এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি এবং সেই শক্তি আছে জনকয়েক বড় ব্যবসাদারের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন, না হয় লোক দিয়ে করান। বণিক বৃত্তিই এখন মুখ্যতঃ রাজনীতি। শোষণের জন্যই শাসন। নইলে তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। দশ পনের বছর পূর্বে যে জগৎব্যাপী সংগ্রাম হয়ে গেল, তার গোড়াতেও ছিল ঐ এক কথা - ঐ বাজার ও খদ্দের নিয়ে দোকানদারদের কাড়াকাড়ি''। কথাটা তাঁর ১৯২৮ সালে বলা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। বলছেন, এই যে যুদ্ধটা হয়েছে, তা বণিকদের বাজার নিয়ে লড়াই। অর্থাৎ তিনি বলছেন রাজতন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদই শোষণের উদ্দেশ্যে শাসন করছে। পরিষ্কার করে বর্তমান রাষ্ট্রের শ্রেণিচরিত্র ও স্বার্থ ব্যক্ত করেছেন। দেখুন, যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে লেনিন যে মূল্যায়ন করেছেন, খানিকটা সেই সুর আমরা তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে দেখতে পাই। এই উপলব্ধি তাঁর ছিল। অথচ, কতদিন আগের কথা — ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদের চিন্তারও তখন ভাল করে প্রচার হয়নি, সবে কিছু কিছু লোক মার্কসবাদ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে মাত্র। তাই যারা শুধু বলেন যে, তিনি জনদরদি ছিলেন, আমি তাদের মতো করে বলার পক্ষপাতী নই। কারণ, শুধু জনদরদি বললে কি তাঁর প্রকৃত মূল্যায়ন হয়? নাকি, তাঁকে বড় করতে গিয়ে আসলে তাঁকে ছোটই করা হয়?

শরৎচন্দ্রর বইগুলো বারবার পড়তে পড়তে এক এক সময় এক একটা জিনিস এসে মনে ধাক্কা দেয়। কিছুদিন আগে আবার নতুন করে পড়তে গিয়ে একটা জায়গায় এসে চোখটা আটকে গেল। কতবার তো শরৎচন্দ্রর বইগুলো পড়েছি, অথচ আগে কখনও চোখে পড়েনি। তিনি একটা জায়গায় বলছেন যে, দুনিয়ায় সহজ বুদ্ধি আয়ত্ত করাই সবচেয়ে কঠিন। কী অদ্ভুত একটা সত্য কথা বললেন। অদ্ভুত বলছি এই কারণে যে, এই যে কথাটা তিনি ওই সময়ে এতদিন আগে বলেছেন, সেটা এই সময়েরও অনেক জ্ঞানীগুণীর, আধুনিক সূক্ষ্মচিন্তার অধিকারী অনেক চিন্তাবিদদের পক্ষেও ধরা মুশকিল। তিনি বললেন, সহজ বুদ্ধি আয়ত্ত করাই দুনিয়ায়

সবচেয়ে কঠিন। কথাটার দ্বারা তিনি কী বলতে চাইলেন? বলতে চাইলেন, সত্যিকারের জ্ঞান অর্জন না করলে সহজ জিনিসটাকে যেমন সহজভাবে দেখা যায় না, তেমনি কঠিন জিনিসেরও উপলব্ধি এমনভাবে হয় না যাতে তার প্রয়োগটা অত্যন্ত সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে হওয়া সম্ভব। মার্কসবাদে এটাকেই বলা হয়েছে, জানা এবং উপলব্ধি করা— দু'টো ভিন্ন জিনিস। অর্থাৎ কেউ পড়াশুনা করে, যুক্তিবিচার করে একটা জিনিস জানতে পারে, এমনকী তার ওপর তর্কাতর্কি করতে পারে এবং বইও লিখতে পারে। কিন্তু, জিনিসটা সে হৃদয়ঙ্গম করেছে— এর অর্থ হল, তার দ্বারা তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যাবে, চরিত্র পাল্টে যাবে, জিনিসটা একদম জলের মতো স্বচ্ছ এবং সহজভাবে সে দেখতে পাবে। সেই মানুষই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের জটিল তত্ত্বগুলো যেমন করে বোঝাতে চায় তেমন করে খেলিয়ে একটা অজ্ঞ চাষিকেও বোঝাতে পারে; যে মানুষটি দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে এমনভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছে যে, তা বোঝাতে গিয়ে বক্তব্যকে তার 'টারমিনোলজি'র দাপটে জটিল করে তুলতে হয় না। কারণ, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উপলব্ধিটা তার কাছে এত সহজ হয়ে গিয়েছে যে, একজন অজ্ঞ চাষির মানসিক কাঠামোর মতন তাকে উপস্থাপনা করবার ক্ষমতা তার আয়ত্তে এসে গেছে।

আবার, ঠিক তেমনি যথার্থ জ্ঞানের উপলব্ধি ঘটলেই কেবলমাত্র সহজ একটা জিনিসকে, সোজা জিনিসকে মানুষ সোজাভাবে দেখতে পারে, নাহলে সাধারণ জিনিসটাকেও সে তার পাণ্ডিত্যের দ্বারা জটিল করে তুলতে পারে। জ্ঞানের উপলব্ধি যথার্থ না হলে একটা সোজা জিনিসও কেমন জটিল হয়ে যায় দেখুন। একটা সোজা কথা যে, যে মানুষগুলো বর্তমান সমাজটাকে পাল্টে নতুন সমাজ গড়বার কথা বলছে, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে লিপ্ত সেই মানুষগুলো যদি নিজেরাই আন্দোলনের নীতি-নৈতিকতাকে অধঃপতিত করে, নিজেদের জীবনেই নীতিসম্মত আচার-আচরণ ঠিকমতো পালন না করে, তাহলে শুধু তারা লড়লে, মরলে এবং প্রাণ দিলেই বিপ্লব হবে না এবং তাদের এই লড়াইয়ের দ্বারা নতুন সমাজ গঠন হবে না। তাহলে আন্দোলনের মধ্যে লিপ্ত দলগুলোর মধ্যে কার শক্তি বেশি, কার জোর বেশি শুধু সেটা দেখলেই চলে না। দেখতে হয়, যারা একটা নতুন আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলছে, তারা নিজেরাও নতুনভাবে গড়ে উঠছে কি না— অন্তত তারা নিজেরা নতুনভাবে গড়ে ওঠার জন্য একটা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করছে কি না। তাহলে আন্দোলনের মধ্যে লক্ষ রাখতে হয়, কোন দলটা শুধু তাদের নেতাদের এবং কর্মীদেরই নয়, আন্দোলনে যাদের নিয়ে আসছে তাদেরও সেইভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এবং তাদের রুচিসংস্কৃতিকেও পাল্টাবার চেষ্টা করছে, আর কোন দলটা শুধু স্লোগান দিচ্ছে, আর 'আমিই করতে পারব, কারণ আমার শক্তি আছে'— শুধু এই যুক্তির ওপর কাজ করছে। এই বিচারের ওপরই যার যার কর্তব্য

নির্ণয় করতে হয়। অথচ, এই সহজ বুদ্ধিটাই সমস্ত বুদ্ধিমানরা গোলমাল করছেন। যতই তাঁদের সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনের সত্যিকারের রাস্তাটা দেখানো হোক এবং যুক্তি দিয়ে সেই কথাটা তাঁরা যতই বুঝুন, ঘুরে ফিরে সেই একই প্রশ্ন তাঁরা বারবার করে চলেছেন যে, আপনারা কি পারবেন? তেমন শক্তি কি আপনাদের আছে? দেখুন, এই কথাটার দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ বুদ্ধিটা তারা গোলমাল করে ফেললেন, তা হচ্ছে, যে দলটা সঠিক রাস্তা দেখাচ্ছে তার না হয় শক্তি কম থাকতে পারে, কিন্তু যার পথটা ভ্রান্ত বলে মনে করছেন, তার বেশি শক্তি থাকলে সেই শক্তির দ্বারা তো সে বেশি অনিষ্ট করবে। তাহলে তাকে সমর্থন করার প্রশ্নটা তাঁরা কোন যুক্তিতে তুললেন। অথচ দেখুন, সব কথা শুনেও দেখা যাচ্ছে, তাঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই একই কথা বলছেন যে, তবুও দেখা যাক যদি সে পারে কিছু করতে। কারণ তার শক্তি আছে। এই যে সহজ বুদ্ধিটা তাঁরা গোলমাল করে ফেললেন, এটাকেই শরৎচন্দ্র বলছেন, দুনিয়ায় সোজা জিনিসটাকেও সহজভাবে দেখতে পাওয়া কঠিন।

আবার আরেক জায়গায় বলছেন, "লোভহীন, ভয়হীন যে দুঃখ তাকে আনন্দের মত উপভোগ করা যায়— সেও আনন্দেরই একটা রূপ।" কী গভীর বিস্ময়ের কথা! দুঃখও যে আনন্দের একটা রূপ হতে পারে — কথাটা কবে বলেছেন তিনি! আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনেও দেখেছি— সেই স্বাধীনতার লড়াইয়ের মধ্যে মর্যাদাবোধের উপলব্ধিই ছিল আপাতদৃষ্ট দুঃখের মধ্যেই আনন্দের একটা রূপ। অন্যায়-অত্যাচার-শোষণের বিরুদ্ধে যারা মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে, তারা শাসক-শোষকদের অত্যাচারের দুঃখ নির্ভয়ে বরণ করে। এটা তাদের কাছে আনন্দদায়ক, কারণ এর মধ্য দিয়ে তারা যথার্থ আত্মমর্যাদা ও মনুষ্যত্বের সন্ধান পায়। কেননা এই দুঃখটা তার ব্যক্তিগত স্বার্থের এবং চাওয়া-পাওয়ার সঙ্গে জড়িত দুঃখ নয়। এটা লোভ এবং ভয় থেকে মুক্ত দুঃখ। এই ভয়শূন্য যে দুঃখ — এটাকেই শরৎচন্দ্র বলছেন, আনন্দের মতোই মানুষ তাকে উপভোগ করতে পারে। এরকম বহু মূল্যবান তত্ত্ব তাঁর বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, সাহিত্যে ও চিঠিপত্রে তিনি স্বল্প কথায় অতি সহজ ভাষায় আলোচনা করেছেন, যা আজও প্রযোজ্য এবং শিক্ষণীয়।

এরকমই আরেকটি মূল্যবান ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উপলব্ধি মিথ্যা আর সত্য মিথ্যায় মিশিয়ে বলার বিষয়কে কেন্দ্র করে। দেখুন শরৎচন্দ্র বলছেন, "মিথ্যা দিয়ে ভুলিয়ে সত্য প্রচার হয় না। সত্যকে সত্যের মত করেই বলতে হয়। তবেই মানুষ যে যার বুদ্ধির পরিমাপে বুঝতে পারে। আজ না পারে ত কাল পারে। সে না পারে ত আর একজন পারে। না-ও যদি পারে, তবুও তাকে মিথ্যার ভূমিকা দিয়ে মুখরোচক করার চেষ্টার মত অন্যায় আর নেই।" আবার বলেছেন, মিথ্যা বলা পাপ, কিন্তু, সত্যমিথ্যায় জড়িয়ে বলার মত পাপ সংসারে অল্পই আছে। এ কথার দ্বারা তিনি কী

বলতে চাইলেন? সেটা হচ্ছে, সত্যকে সত্যের পথে, সঠিক পথে বুঝিয়ে কাজ কর, না হলে ক্ষতি হবে, অন্যায় হবে। যেটা আজকাল রাজনৈতিক নেতা ও অন্যেরা হামেশাই ট্যাকটিক্সের দোহাই দিয়ে করে থাকে। আর বললেন, যেটা মিথ্যা, সেটা বললে ক্ষতি হয় একথা ঠিক। কারণ, মিথ্যাকে সত্য বলে ভাবলে তার দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং কেউ যদি বিভ্রান্ত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে আবার অপরকে বোঝায়, তাহলে তার দ্বারা অপর মানুষও বিভ্রান্ত হয় এবং তাতে সমাজের ক্ষতি হয়। এটা ঠিক কথা। কিন্তু, এটা যেহেতু মিথ্যা, সেহেতু যারা যথার্থ সত্যানুসন্ধানী, যারা সত্যকে জানতে চাইবে, সত্যকে জানবার জন্য যারা লড়বে তাদের এটা সাময়িক ক্ষতি করলেও বেশিদিন ক্ষতি করতে পারবে না। সত্যানুসন্ধানী মানুষ সত্যকে জানবেই এবং সত্য জানতে গিয়ে মিথ্যার স্বরূপটা দু'দিন বাদেই তাদের কাছে ধরা পড়বে। অর্থাৎ, মিথ্যাটাকে ধরতে তাদের এত অসুবিধা হবে না। খানিকটা অসুবিধা হবে ঠিকই, কিন্তু, তত অসুবিধা হবে না। অথচ, সত্যমিথ্যায় জড়িয়ে বললে মিথ্যার স্বরূপ ধরা মানুষের পক্ষে ভয়ানক অসুবিধা হয়ে পড়ে। কারণ, সত্যের শক্তি অমোঘ বলে মিথ্যার মধ্যে যখন খানিকটা সত্য জড়িয়ে থেকে মিথ্যার স্বরূপটাকে ঢেকে রাখে, তখন সেই সত্যটা এসে সহজে মিথ্যাটাকে ধরতে দেয় না। মিথ্যার মূল কাঠামোটাকে পুরো দেখতে দেয় না। সত্যের শক্তি আছে বলে, আর মানুষ স্বভাবতই সত্যকে সমর্থন করতে চায় বলে, সত্য সমর্থনের প্রবল আকাঙক্ষায় তারা মিথ্যাটাকে গ্রহণ করে বসে। ফলে, মানুষের মিথ্যা ধরতে, মিথ্যার স্বরূপ উদঘাটন করতে এবং বুঝতে অনেক সময় লেগে যায়। সেজন্য মানুষের কল্যাণের পক্ষে, প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে এর দ্বারা অনেক বেশি ক্ষতি হয়, অনেক বেশি অনিষ্ট হয়।

ঠিক এই কথাটাই, তত্ত্বের এই ধারণাটাই লেনিন আর একটা পরিপ্রেক্ষিতে অন্য ভাষায় বললেন। কথাটা কিন্তু এক, অন্তত আমি বুঝেছি তাই। লেনিন বললেন, অসৎ একজন ধর্মযাজকের চেয়ে একজন সৎ ধর্মযাজক প্রগতিশীল আন্দোলনের পক্ষে অনেক বেশি বিপজ্জনক এবং অনেক বেশি বড় শত্রু। লেনিন একথাটা কেন বললেন? কারণ, যে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেই একমাত্র মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, মানুষের মুক্তি প্রচেষ্টার মধ্যেই যেখানে সত্য নিহিত রয়েছে, অর্থাৎ যে রাস্তায় গেলে মানুষের যথার্থ মুক্তি হবে, একজন সৎ ধর্মযাজক 'এগুলো কিছু নয়' বলে মানুষকে সেই রাস্তা থেকে যে কোনও কৌশলেই হোক সরিয়ে রাখে, তাকে বিপথে নিয়ে যায়। সততার দ্বারা বিভ্রান্ত হয় বলে মানুষের ধর্মবুদ্ধি, তার পরলোকের আত্মার ধারণা, তার পাপ-পুণ্যের নানা সংস্কার, তার নানা অজ্ঞতার ওপর কাজ করে একজন ধর্মযাজক মানুষকে তার আন্দোলনের পথ থেকে, অর্থাৎ মুক্তির যেটা যথার্থ রাস্তা সেই রাস্তা থেকে তার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে মিথ্যা এবং অসত্যের রাস্তায়

টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু, একটা অসাধু ধর্মযাজক এই কাজ করলে তার মিথ্যাটা অতি সহজেই মানুষ ধরতে পারে, কারণ সে অসাধু। তাকে অবিশ্বাস করে বলে সহজেই তার প্রচারিত বক্তব্যগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করবার একটা মানসিক প্রবণতা মানুষের দেখা দেয় এবং সহজেই মানুষ বুঝতে পারে যে, এগুলো ঠিক নয়, এ বাজে, বুজরুকি, খারাপ। ফলে, একজন সৎ ধর্মযাজক মানুষের বেশি বিপদ করতে পারে।

বিজ্ঞান ও দর্শনের গভীর তত্ত্বের কথা শরৎ সাহিত্যে কত সহজে সরলভাবে পরিবেশিত হয়েছে এমন বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে কয়েকটি আপনাদের কাছে আমি উপস্থিত করলাম। এবার আপনারাই বিচার করে দেখুন তিনি কত বড় তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন।

শরৎচন্দ্র ও কৃষক-শ্রমিক আন্দোলন

আর একধরনের বিভ্রান্তি আমাদের দেশে তথাকথিত মার্কসবাদী মহলে লক্ষ করছি। তাঁদের মতে শরৎচন্দ্র নাকি প্রগতিশীলই ছিলেন না। কারণ, তিনি তাঁর সাহিত্যে শ্রমিকের জয়গান গাননি, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলেননি, মজুর-চাষির আন্দোলনের কোনও কাহিনী তিনি লেখেননি এবং অন্যান্য যা লিখেছেন সেগুলো মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেননি। ফলে, তিনি কীসের প্রগতিশীল? তাদের বক্তব্য শুধু এইটুকু নয়। তাঁরা আরও বলেন, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে তো অনেক সময় দেখা যায় নায়ক জমিদারের ঘরের ছেলে। কাজেই তিনি তো সামন্তবাদী সাহিত্যিক। অথচ আমি যতদূর জানি, এদেশের সাহিত্যে শরৎচন্দ্রই প্রথম গরিব কৃষকদের উপর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, জমিদারদের নিষ্ঠুর শোষণ ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'মহেশ' গল্প আজও পড়লে চোখের জল আটকানো যায় না। জমিদারতন্ত্র ও হিন্দুধর্মের কী নিষ্ঠুর অত্যাচার গরিব মুসলমান ভাগচাষি গফুরের উপর। গফুর তার গরু মহেশকে কীভাবে প্রাণ দিয়ে সন্তানতুল্য ভালবাসে, তার মুখের গ্রাস খড় হিন্দু জমিদার কেড়ে নিল, অথচ সেই জমিদার দু'বেলা শাস্ত্রের দোহাই দেয়। গফুরকে শেষপর্যন্ত গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করল। শরৎচন্দ্র পাঠকদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে দিলেন, প্রকৃতপক্ষে মহেশকে কে খুন করল? এই গল্পে আরেকটা করুণ ঘটনাও দেখালেন। মুসলিম বলেই ছোট মেয়ে আমিনা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে, কোন হিন্দু মেয়ে যদি তাকে কূয়ো থেকে পানীয় জল দেয় দয়া করে। কারণ হিন্দু প্রধান গ্রামে সে মুসলিম বলে কুয়োর জল স্পর্শ করতে পারে না। শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজ', 'দেনাপাওনা', 'বামুনের মেয়ে' ইত্যাদি উপন্যাসে জমিদাররা কীভাবে গরিব চাষিদের জমি গ্রাস করে সর্বস্বান্ত করছে, সেই নির্মম চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। ফলে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এসব মন্তব্য শুনলে মনে হয়, যাঁরা এ ধরনের কথা বলছেন, তাঁরা

সাহিত্যবিচারের যোগ্যই নন অথবা ঠিকই করেছেন যে, যেভাবেই হোক শরৎচন্দ্রের অবমূল্যায়ন করে যাবেন এবং সেই অনুযায়ী বলে যাচ্ছেন। প্রসঙ্গত এখানে আর একটা কথাও বলে যেতে চাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় শরৎচন্দ্র মুসলিম সমাজের সমস্যা নিয়ে কোনও সাহিত্য রচনা করে যেতে পারেননি। শেষজীবনে যদিও তিনি বলেছিলেন, ভাল করে জেনে এই সাহিত্য রচনায় হাত দেবেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ব্যাঘাত ঘটায়। এতদ্‌সত্ত্বেও শুধু গফুর নয়, পল্লীসমাজের লাঠিয়াল আকবর, শ্রীকান্ত'র গহর কবি এবং দেনাপাওনার ফকির সাহেবের যে চরিত্রগুলি এঁকেছেন, সেগুলি খুবই জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে আমরা আজকের সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নত আদর্শ বলি। চিন্তার দিক থেকে তার অনেক কাছাকাছি শরৎচন্দ্র এসে গিয়েছিলেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী চিন্তাধারার পদধ্বনি তাঁর মধ্যে খানিকটা ভাসাভাসা হলেও শোনা যাচ্ছিল। মজুর আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি মডারেট বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোনও জায়গায় মেলে না। কারণ, বুর্জোয়া বিপ্লববাদ যে মজুর আন্দোলন করেছে, তা করেছে শ্রমিক কল্যাণের অর্থে, তাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা কিছু পাইয়ে দেওয়া। তারা অর্থনীতিবাদের আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। 'পথের দাবী'তে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন, তা পুরোপুরি মার্কসবাদসম্মত না হলেও নিঃসন্দেহে তা মজুর আন্দোলনে অর্থনীতিবাদ ও সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরকে প্রতিফলিত করেছে। তিনি সেখানে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন যারা মাহিনাবৃদ্ধির এবং কিছু কিছু সংস্কারের জন্য মজুর আন্দোলন করে, বা মজুরদের সংগঠিত করে, তারা মজুর দরদের আলখাল্লার আড়ালে মজুরদের সর্বনাশ করে সবচাইতে বেশি। তারা আসলে এই কাজের দ্বারা বিপ্লবেরই বিরোধিতা করে। যদিও শ্রমিক আন্দোলনে সম্পূর্ণ সর্বহারা বিপ্লববাদের ছবিও তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিল না। কিন্তু, এইসব চিন্তাভাবনা তাঁর মধ্যে এসে ধাক্কা দিয়েছে। তিনি সমস্ত সামাজিক সমস্যাগুলিকে ঠিক বুর্জোয়া বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই দেখেননি।

শরৎচন্দ্রের সময়ে বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে শেষের দিকে এসে চিন্তা-ভাবনাটা শুধু স্বাধীনতা অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, তার মধ্যে আর একটা ধারা এসে গেল, তা হচ্ছে, পুঁজিবাদের পথে না গিয়ে যাতে দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। মানবতাবাদী মূল্যবোধ এবং তৎকালীন সময়ে উচ্চ রুচির মান প্রতিফলিত করার দিক থেকে শ্রীকান্ত উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য যাই থাকুক না কেন, শ্রমিক সংস্কৃতির অর্থে তার মূল্য কতটুকু! কিন্তু তবুও দেখুন, শ্রীকান্তর তৃতীয় পর্বের একটা জায়গায় যেখানে রেললাইন বসানোর কাজ চলছিল, শ্রীকান্ত মজুর বস্তির মধ্যে দুই দিন কাটাতে বাধ্য

হয়েছিল, সেখানে মজুরদের চূড়ান্ত দূরবস্থা দেখে এবং তাদের পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা ও হৃদয়বৃত্তির ধ্বংস হওয়া প্রত্যক্ষ করে পুঁজিবাদী সভ্যতা সম্পর্কে শ্রীকান্তর মুখ দিয়ে স্বল্পকথায় যে অবিস্মরণীয় উক্তি বেরিয়ে এসেছে, সেটা ঠিক মানবতাবাদীদের মতো কথা নয়। তার থেকেও উন্নত চিন্তাকে প্রতিফলিত করেছে। যদিও সর্বহারা সংস্কৃতি বলতে আমরা যা বলি বা শ্রমিকচেতনা বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়। কিন্তু প্রায় তারই কাছাকাছি। পুঁজিবাদ যে মানুষের মনুষ্যত্বকে, হৃদয়বৃত্তিকে কীভাবে ধ্বংস করে পশুতে পর্যবসিত করছে মুনাফার লোভে — স্বল্প কথায় তিনি যেভাবে বলেছেন, আমি যতদূর জানি বিশ্বে অন্য কোনও সাহিত্যে এভাবে পাওয়া যায় না। তিনি বলছেন, ‘‘সভ্যতার অজুহাতে ধনীর ধনলোভ মানুষকে যে কতবড় হৃদয়হীন পশু বানাইয়া তুলিতে পারে, এই দুটা দিনের মধ্যেই যেন এ অভিজ্ঞতা আমার সারা জীবনের জন্য সঞ্চিত হইয়া গেল। ... সভ্য মানুষে একথা বোধহয় ভালো করিয়া বুঝিয়া লইয়াছে মানুষকে পশু করিয়া লইতে না পারিলে পশুর কাজ আদায় করা সম্ভব না।’’ এটা দেখেই তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, ‘‘মানুষের মরণ আমাকে বড়ো আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।’’ এরপরই তিনি পুঁজিবাদ ধ্বংসের আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, ‘‘আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা, তোরা মর। কিন্তু যে নির্মম সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস না। যদি বহিতেই হয়, ইহাকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলে বহিয়া নিয়া যা’’। অর্থাৎ ধ্বংসের পথে বয়ে নিয়ে যা। সেক্যুলার মানবতাবাদের ভিত্তিতে যে মূল্যবোধের ধারণা ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম যুগে গড়ে উঠেছিল, শরৎচন্দ্রের এই মূল্যবোধ তার থেকেও আরও উন্নত, আরও অগ্রসর। শ্রমিকশ্রেণির ঐক্য এবং লড়াই সম্পর্কে পথের দাবীতে তলোয়ারকরকে দিয়ে বলিয়েছেন ‘এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই। এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই, মতবাদ নেই — হিন্দু নেই, মুসলমান নেই — জৈন, শিখ কোনও কিছুই নেই — আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক। তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়! অক্ষম, দুর্বল, মুর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ তোমরাই যে তাদের বিলাস-ব্যসনের একমাত্র পাদপীঠ। তাই মাত্র তোমাদের জীবনধারণটুকুর বেশি তিলার্ধ যে তারা স্বেচ্ছায় কোনও দিন দেবে না — এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি তোমাদের এতই কঠিন?’’ অর্থনীতিবাদের বিরোধিতা করে শ্রমিক ধর্মঘটের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পথের দাবীতে তিনি বলেছেন “ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব ধর্মঘট বলে কোথাও কিছু নাই। সংসারে কোনও ধর্মঘটই সফল হয় না যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। ধনীর আর্থিক ক্ষতি আর দরিদ্রের অনশন এক নয়। ... কোথাও

কোনও দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না। একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই তো তার অবলম্বন। যে মুর্খ একথা জানে না, শুধু মজুরির কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায় সে তাদেরও ক্ষতি করে, দেশেরও ক্ষতি করে।'' এইভাবে শ্রমিকশ্রেণির পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কে এমন সব কথা বলেছেন, যেগুলো মার্কসবাদের প্রায় কাছাকাছি। পথের দাবীতেই তিনি বললেন, ''বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না। তাই শ্রমিকও ... সকল বস্তু, সকল কারখানার অধিকারী''। অথচ, তিনি হচ্ছেন আসলে কিন্তু পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের লেখক, মানবতাবাদের লেখক। কিন্তু, যেহেতু সেদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে মার্কসবাদ বা শ্রমিক আন্দোলনের চিন্তা-ভাবনাগুলো এসে ধাক্কা দিচ্ছিল — শরৎচন্দ্র তার অনেকখানি কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন।

যাদের মত অনুযায়ী, শরৎসাহিত্য সর্বহারা সাহিত্য না হওয়ার জন্য যদি তার কোনও মূল্য না থাকে, তাহলে তো বলতে হয়, টলস্টয়ের সাহিত্যেরও কোনও মূল্য ছিল না। কারণ, তা সর্বহারার সাহিত্য ছিল না। অথচ, টলস্টয়কে সর্বহারা বিপ্লবের মহান নেতা লেনিন ঠিক ঠিক বুঝেছিলেন বলেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, টলস্টয়ের সাহিত্যই রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সর্বহারা বিপ্লবের মানসিক জমি তৈরি করে দিয়ে গেছে। টলস্টয়ের এই সঠিক মূল্যায়নের পথেই টলস্টয়ের সঙ্গে ভাবগত জগতে ছেদ ঘটিয়ে বা বিরোধে গিয়ে লেনিন রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লবের আদর্শগত পথ দেখিয়েছেন। আমাদের এখানেও সেই একই প্রশ্ন। শরৎচন্দ্র একজন সর্বহারা সাহিত্যিক ছিলেন, একথা কেউই বলছে না। কিন্তু, শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করতে হলে তিনি যে যুগের, যে সমাজের লেখক, সেই যুগে, সেই সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল চিন্তাধারা কী ছিল তা জানতে হবে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ, যে দেশে, যে সমাজে, যে পরিবেশে তিনি লিখেছেন — তার ভিত্তিতেই তাঁকে বিচার করতে হবে। সেই যুগটাকে আলোচনা না করে কোনওমতেই শরৎসাহিত্যের বিচার হতে পারে না, তাঁর মূল্যায়নও হতে পারে না। এটাও লক্ষ রাখতে হবে, শরৎচন্দ্র সেই যুগের পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যা টলস্টয় ছিলেন না। মূলত মজুরদের নিয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্য রচনা করেননি। কিন্তু তিনি চাষি-মজুরদের কথা একেবারেই লেখেননি, এ ধারণাও সত্য নয়। মজুরদের কথা তিনি বিভিন্ন উপন্যাসে কিছু কিছু বলেছেন এবং পথের দাবী-তে মজুর আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। শ্রমিক আন্দোলনকে তিনি উৎসাহিত ও সাহায্য করেছিলেন, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আহ্বান জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে গান্ধিজি যাঁকে অন্যতম শিক্ষক হিসাবে গণ্য করতেন, সেই টলস্টয় বিপ্লববিরোধী হওয়া সত্ত্বেও লেনিন কিন্তু টলস্টয়কে 'মিরর অফ রাশিয়ান রেভলিউশন' বা 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ' বলে অভিহিত করেছিলেন। অথচ দৃষ্টিভঙ্গিতে টলস্টয়ের সাথে শরৎচন্দ্রের কত

পার্থক্য ছিল। এই লেনিন যদি শরৎ সাহিত্য পড়তেন, তাহলে তিনি কী মূল্যায়ন করতেন?

এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম জন্মদাতা

শরৎচন্দ্র ছিলেন বাংলায় শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোক্তা। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সংগ্রামে তিনি প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। কংগ্রেস তখন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি চালাচ্ছে। বরদা পাইন সেই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট। তাঁর দ্বারা উদ্বুদ্ধ কংগ্রেস কর্মীরা হাওড়া মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠন করে শ্রমিকদের ধর্মঘট করে বসল। সেই ধর্মঘট যখন বরদা পাইন গুন্ডা দিয়ে, পুলিশ দিয়ে মারদাঙ্গা করে দমন করার জন্য চেষ্টা করলেন, তখন তিনি বরদা পাইনকে একটা চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি বললেন, তোমরা যদি ধর্মঘটী শ্রমিকদের দাবি না মেনে নাও, আর গুন্ডা যদি তুলে না নাও, তাহলে আমি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে মিউনিসিপ্যালিটির পরিচালকদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি ময়দানে নামব। সঙ্গে সঙ্গে বরদা পাইন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে আপসরফায় এলেন।

তিনি কলকাতার আশেপাশে সেইসময়ে একটি 'সমাজতান্ত্রিক গ্রুপ'ও খাড়া করেন, যখন সোস্যালিজমের কথাও এদেশে ভাল করে আসেনি। শ্রমিক আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি একজায়গায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "দেখ, আজ আমাদের দেশের শ্রমিকরা জাগ্রত নয়, সংঘবদ্ধ নয়, পীড়ন ও শোষণও তাদের ওপরে অকথ্য, বর্বরভাবে চলছে। আজ তোমাদের দরকার রয়েছে তাদের জাগাবার কাজে, সংঘবদ্ধ করবার কাজে আত্মনিয়োগ করবার জন্য। কিন্তু একথা জেনো, যেদিন এদের ঘুম ভাঙবে, এদের ভিতরে সংঘবদ্ধতা আসবে, সেদিন ওদের নিজেদের ভিতর থেকেই ওদের নেতা তৈরি হবে। সেদিন তোমরা হবে অনাবশ্যক। সেদিন ওদের পরিচালনার ভার ওদের নেতাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে খুশি মনে চলে আসতে পার, তোমাদের মনকে এমনভাবেই তৈরি করে তোলা দরকার। কাজ করবার সঙ্গে যেন চিরকাল ওদের নেতৃত্ব করবার মোহ মনের মধ্যে না জন্মায়।"

এই শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামকে নেতৃত্ব দেবে কারা? সেটা একমাত্র যথার্থ কমিউনিস্টরাই দিতে পারে। সেই কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কীভাবে আয়ত্ত করতে হবে এই সম্পর্কে লেনিন বলেছেন, "আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ থেকে বুর্জোয়া মানবতাবাদ এবং পুঁজিবাদ গড়ে ওঠা পর্যন্ত এই সমস্ত যুগ ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াইতে যত ভাল এবং যত সুন্দর জিনিস গড়ে উঠেছে সমস্ত যুগের সেই ভালগুলোর, সেই সুন্দরগুলোর এক সম্মিলিত উপলব্ধিবোধই আমাদের কমিউনিস্ট

করে তুলেছে। আমরা তার সবেরই উত্তরাধিকারী। অতীতের সমস্ত ভাল এবং সুন্দর জিনিসগুলিই আমরা আমাদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। তবেই আমরা কমিউনিস্ট হয়েছি।''

শরৎচন্দ্রের বিচার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের কাছাকাছি

'পথের দাবী' উপন্যাসে দর্শনের দিক থেকেও নানাভাবে কতকগুলি কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। সেই কথাগুলির মাধ্যমে তিনি যেন মানবতাবাদী চিন্তার সীমাকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছেন। আজকের দিনে মানবতাবাদী মূল্যবোধ একটা ধাঁচে এসে গিয়েছে। তা ভালমন্দ, রুচি এবং সৌন্দর্য সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে একটা শাশ্বত রূপ বা কাঠামো দাঁড় করিয়েছে। যে ধারণাগুলি একদিন মানুষের বাস্তব প্রয়োজনে এবং পুঁজিবাদী বিপ্লব ও উৎপাদনের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল, পরবর্তীকালে মানবতাবাদীরা তাকে স্থায়ী, শাশ্বত হিসাবে মর্যাদা দিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে। বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের সৌন্দর্যবোধ, নীতি-নৈতিকতা ও রুচি সংক্রান্ত এই ধরনের শাশ্বত ধারণার সঙ্গে মার্কসবাদীদের সৌন্দর্যবোধ, নীতিনৈতিকতা ও রুচি সংক্রান্ত ধারণার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার একটা সংযোগ থাকলেও এই দু'টি আসলে সম্পূর্ণ আলাদা আদর্শগত কাঠামো। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ যে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা বলে, বিজ্ঞান যে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা বলে, সেই প্রয়োজনতত্ত্ব বাস্তব থেকে উদ্ভুত, সেই প্রয়োজনের আলোকে সমাজের ভাব, আদর্শ, চিন্তা-ভাবনাগুলোর সত্যাসত্য নির্ধারিত হয়। তা ব্যক্তির হীন স্বার্থবোধ বা প্রয়োজন নয়। পথের দাবীতে দেখুন অনেকটা এইরূপ যুক্তিধারা ও চিন্তাধারারই যেন প্রতিফলন ঘটছে। যদিও শরৎচন্দ্রের মধ্যে চিন্তার প্রধান দিকটাই মূলত পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ, এদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে 'এনার্কিজম' যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তা এবং যা যৌবনোদ্দীপ্ত মানবতাবাদকেই প্রতিফলিত করেছে, তবুও অনেক জায়গাতেই তাঁর এই বইখানিতে তিনি মানবতাবাদী চিন্তাকেও ছাড়িয়ে যেতে চেয়েছেন এবং কমিউনিস্ট চিন্তাধারা ও বিচারধারার কিছু কিছু জিনিস যেন বিদ্যুত চমকের মতো তাঁর মধ্যে খানিকটা জায়গা করে নিয়েছে। পথের দাবীতে এক জায়গায় সব্যসাচী বলছেন, ''পথের দাবীর ভালমন্দ দিয়েই আমার সত্যমিথ্যা নির্ধারিত হয়। এই আমার নীতিশাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্তি।'' অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন, দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে পথের দাবী সংগঠনের প্রয়োজন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর, স্বাধীনতার প্রশ্নের সঙ্গে যেহেতু ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে, তাই যা পথের দাবীর প্রয়োজন, তা স্বাধীনতার প্রয়োজন এবং যা স্বাধীনতার প্রয়োজন তাই-ই সব্যসাচীর কাছে সত্য। তারই প্রয়োজনে তার সত্য সৃষ্টি।

দেখুন, সত্যিকারের নৈর্ব্যক্তিক প্রয়োজনের সঙ্গে তিনি হীন ব্যক্তি প্রয়োজনের পার্থক্য কোথায়, তা চমৎকারভাবে নির্ণয় করেছেন। তা না হলে, যে কোনও মানুষই তো তার ব্যক্তি-প্রয়োজনটাকেই সত্য বলে চালাতে পারে। তাই প্রয়োজন বলতে যেকোনও মানুষের যেকোনও ব্যক্তিগত প্রয়োজন উপলব্ধিকে তিনি বোঝাতে চাননি। সমাজ, মানুষ এবং ইতিহাসের যেটা নির্বিশেষ এবং সত্যিকারের প্রয়োজন, যেটা নিছক ব্যক্তিপ্রয়োজন নয়, তিনি সেই প্রয়োজনের দিকটাকেই ইঙ্গিত করেছেন। তাই সব্যসাচী ভারতীকে বোঝাচ্ছেন, ''স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হলে রক্তের হোলি খেলতে হবে এবং তার জন্য দরকার হলে মানুষও খুন করতে হবে, কিন্তু সব্যসাচীর প্রয়োজন এবং ব্রজেন্দ্রর প্রয়োজন এক নয়''। এই দুইয়ের প্রয়োজন সম্পর্কিত উপলব্ধি এক নয় বলেই ব্রজেন্দ্র ব্যক্তিগত আক্রোশে মানুষ খুন করে। আর, যে সব্যসাচীর জীবন অপূর্বর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে চূড়ান্তভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল, তিনিই অপূর্বকে সবচেয়ে বেশি উদারতা দেখালেন। অন্য সবাই যখন অপূর্বর জীবন নেওয়ার জন্য অন্ধের মতো, যন্ত্রের মতো ডিসিপ্লিনকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে, ডিসিপ্লিন যে প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত এবং যা প্রয়োজন অনুসারেই পুনর্বিন্যস্ত হয়, এই বোধও যখন তারা হারিয়ে ফেলেছে, তখন সব্যসাচী কিন্তু তাঁর নিজের জীবন যার জন্য বেশি বিপন্ন হয়েছিল, তাকেই বাঁচিয়ে দিলেন। ঔদার্যের জিনিস যেখানে যতটুকু চোখে পড়েছে তাকেই তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু তিনিও মনের অনুভূতি নিয়ে ভাববার তেমন অবসর পাননি, চিন্তাও করেননি। তাই সুমিত্রা তাঁকে একটা ঢাকা দেওয়া বয়লারের সঙ্গে তুলনা করেছিল — যে ঢাকা দেওয়া বয়লারটা বাইরে থেকে নিরুত্তাপ এবং ঠাণ্ডা মনে হলেও ভেতরে তার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। ভারতীকে নিয়ে সুমিত্রা যখন কারখানা পরিদর্শন করছে, তখন বয়লারের ঢাকনিটা খুলে যাওয়া মাত্রই তার ভিতরের আগুনটা প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে গমগম করছিল। সেটা দেখবার পর সুমিত্রার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। সে ভারতীকে বলছে, ''এই ভয়ানক যন্ত্রটাকে চিনে রাখ, তোমাদের ডাক্তারবাবুকে চিনতে পারবে''। মানে সুমিত্রা বলছে যে, সব্যসাচীরও বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু তার ভিতরে শুধু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, সমস্ত কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কিন্তু সব্যসাচীর সমস্ত কিছুই যে ছাই হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ অপূর্বকে ক্ষমা করা, তাকে প্রাণদান, তার প্রমাণ ভারতীর সঙ্গে তার অমন স্নেহময় মধুর সম্পর্ক। কিন্তু এ নিয়ে বেশি মাথা ঘামানো বা বিলাস করার অবকাশ তার ছিল না। রাজেনও প্রায় অনুরূপ। শরৎচন্দ্রের এইসব চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার প্রভাব আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ঘটনাগুলো দিয়ে আমি দেখাতে চাইছি যে, অতীতের ইউরোপের মানবতাবাদী সাহিত্য, যা ভালবাসার স্বাধীনতা নিয়ে লড়েছে — তাদের যে একদেশদর্শিতা —

সেই একদেশদর্শিতা থেকে শরৎচন্দ্র মুক্ত ছিলেন। সেটাও তখনকার সামাজিক পরিস্থিতিতে অনেক বিপ্লবাত্মক ভূমিকা পালন করেছে।

অপূর্বকে বাঁচিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিধারা কী অদ্ভুত দেখুন! তিনি বলছেন, "অপূর্ববাবু যা করে ফেলেছেন, সে আর ফিরবে না। তার ফলাফল আমাদের নিতেই হবে। শাস্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে"। আজকের দিনে আমরা যেমন দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচার করি যে, একটা বিভ্রান্ত লোক আমাদের অনেক অনিষ্ট করতে পারে, আবার একটা লোক নিশ্চিতভাবে শত্রুপক্ষের এজেন্ট হয়েও আমাদের অনেক অনিষ্ট করতে পারে, কিন্তু এই দুটো লোককে কোনওমতেই এক দৃষ্টিতে দেখা যায় না — ঠিক তেমনি সব্যসাচী যে অপূর্বকে বাঁচিয়ে দিলেন, তার কারণ, তিনি একজন প্রকৃত বিশ্বাসঘাতক এবং একজন দুর্বল চরিত্রের মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। তাই সব্যসাচী অপূর্বর সম্পর্কে এক জায়গায় ভারতীকে বলছেন, "বাস্তবিক বলছি তোমাকে এত ছোট, এত হীন সে কখনো নয় ... লেখাপড়া শিখেছে, ভদ্রলোকের ছেলে, পরাধীনতার লজ্জা সে অনুভব করে। আরো দশজন বাঙালি ছেলের মত সত্য সত্যই সে স্বদেশের কল্যাণ প্রার্থনা করে। অপূর্ব ট্রেটর নয়, স্বদেশকে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসে। কিন্তু অধিকাংশ...", বলেই বাকিটা উহ্য রেখে তিনি বলছেন, "থাক স্বজাতির নিন্দা আর করব না,— কিন্তু বড় দুর্বল।" তার অনুক্ত কথার মধ্যে স্বজাতি সম্পর্কে কত গভীর বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে। অর্থাৎ সব্যসাচী বলতে চাইছেন, এইসব দিকগুলো থাকা সত্ত্বেও অপূর্ব বড় দুর্বল। আমাদের বহু বাঙালির মতো অনেকটা তার অবস্থা। কিন্তু অপূর্ব এবং ভারতীর জীবনকে কেন্দ্র করে যে সৌন্দর্য এবং মাধুর্য গড়ে উঠেছে, তার কি কোন মূল্য নেই? তাই তারপরই সব্যসাচী ভারতীকে বলছেন, "যে বস্তু তোমাদের মত এই দুটি সামান্য নরনারীকে উপলক্ষ্য করে গড়ে উঠেছে, তার কি কোনও দাম নেই নাকি যে, ব্রজেন্দ্রর মত বর্বরগুলোকে দেব তাই নষ্ট করে ফেলতে? শুধু এই ভারতী শুধু এই। নইলে মানুষের প্রাণের মূল্য আছে নাকি আমাদের কাছে। একটা কানাকড়িও না।" অর্থাৎ শরৎচন্দ্র দেখালেন সেই যুগে বিপ্লব বিরোধীরা যে প্রচার করত, বিপ্লবীরা খুনি, তাদের দয়ামায়া নেই, ভালবাসা নেই, নিষ্ঠুর— এটা কতবড় মিথ্যা! আর একটা জায়গায় 'বিদ্রোহ' শব্দটাকে 'বিপ্লব' থেকে আলাদা করে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, বিপ্লব আর বিদ্রোহ এক নয়। তাই প্রবর্তক সংঘের মতিবাবু যখন কিরণময়ী প্রসঙ্গে একটা প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তাঁকে সমাজসংস্কারক বলেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, না, আমি বিপ্লবী। আমি 'পথের দাবী'তে বলেছি, "সংস্কার মানে মেরামত, উচ্ছেদ নয় — গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা। যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে, মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত

করার যে কৌশল বোধ হয় তারই নাম শাসন সংস্কার। একটা দিনের জন্যও এই ফাঁকি আমি চাইনি।" তিনি বলেছেন, এটা শুধু রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতেই আমি বলিনি, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি চেয়েছি এই সমাজটার আমূল পরিবর্তন। মতিবাবুদের আলোচনার ধারা ছিল, হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করে, অর্থাৎ জাতপাতের ধারণাকে সংস্কার করে তার মধ্যে উদারতা এনে এবং তাকে আধুনিকীকরণ করে যুগোপযোগী করা যায় কি না। শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, এ ধরনের চিন্তার সঙ্গে আমার কোনও মিল নেই। এ আপনারা চেষ্টা করলেও পারবেন না। কারণ, এর আবেদন শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে, যা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাকে যেতে দিতে হবে। বরঞ্চ, আপনারা যদি পারেন, যত দ্রুত সম্ভব তার যাওয়ার পথটাকে ত্বরান্বিত করুন। এই ধারণাগুলো সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম এদেশে এনেছেন।

আবার এই শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অনেক তথাকথিত কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল সমালোচকদেরও বলতে শুনেছি যে, শরৎচন্দ্র 'বিপ্রদাস' বইখানিতে হিন্দু 'রিভাইভ্যালিজম'-এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে পুরোপুরি একমত নই। আমার মনে হয়, এঁরা 'বিপ্রদাস' বইখানা উপর উপর পড়েছেন। ভাল করে পড়েননি, অথবা পড়ে থাকলেও, এই বইখানার মধ্য দিয়েও শরৎচিন্তার যে মূল সুরটি বেরিয়ে এসেছে তা তাঁরা ধরতে পারেননি। তবে একথা সত্য, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু রিভাইভ্যালিজম-এর যে প্রভাব ছিল, শরৎচন্দ্রের একখানা উপন্যাসের মধ্যেই কেবলমাত্র আমরা তার প্রভাব দেখতে পাই — সেটি হ'ল 'বিপ্রদাস'। কিন্তু এখানে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে, একজন সাহিত্যিকের মধ্যে বহু ভাবনার সংঘাত ঘটে, বহু জিনিস তার চিন্তার মধ্যে আসে। সেই কারণে একজন সাহিত্যিককে বিচার করার সময় তার চিন্তাভাবনার প্রধান দিকটা আমাদের বিচার করতে হয়। যেমন, কোনও একজন মানুষকে আমরা যখন ভাল বলি, তখন কি কথাটা এরকম যে, তার মধ্যে এতটুকু মন্দ জিনিস নেই? এরকম কোনও ভাল মানুষ বা মহৎ ব্যক্তি আছে কি, যার এতটুকুও দোষের দিক নেই? আবার এমন অসৎ এবং খারাপ লোক আছে কি, যার মধ্যে এতটুকু গুণের দিক নেই? না, প্রতিটি মানুষই ভালমন্দ মিশিয়ে মানুষ, সব মানুষই দোষে গুণে মানুষ। তাহলে কোনও মানুষ ভাল কি মন্দ আমরা বিচার করি কী দিয়ে? বিচার করি, তার গুণের দিকটা বড়, না দোষের দিকটা বড়, সেটা দিয়ে। যার চরিত্রের মধ্যে দোষের দিকটা বড়, তাকে আমরা বলি খারাপ মানুষ, আর যার দোষগুণের মধ্যে গুণটা বড়, তাকে আমরা বলি ভাল মানুষ। আবার এই গুণের তারতম্যের ওপর আমরা ভাল মানুষের মধ্যে স্তর ভাগ করি। ঠিক তেমনি কোনও সাহিত্যিকের মূল্যায়নও একদেশদর্শী হতে পারে না। তাঁর চিন্তার মধ্যে নানা জিনিস থাকে, কিন্তু তার সাহিত্যমূল্য বা চরিত্র নির্ণয় করতে হয় তাঁর চিন্তা-ভাবনার প্রধান দিকটি দিয়ে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার প্রধান দিকটি হচ্ছে আপসহীন, সেক্যুলার, বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদ, তবে তার মধ্যেও দুর্বলতার দু-একটি দিক আছে।

কিন্তু তবুও দেখুন, শেষপর্যন্ত সেখানেও রিভাইভ্যালিজমের জয়গান তিনি গাননি। স্বদেশি আন্দোলনের মধ্যে হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের যে প্রভাব বর্তমান ছিল, তার প্রবল চাপ এড়াতে না পেরে তিনি এই বইখানা লিখেছিলেন। কারণ, তৎকালীন সময়ে ইংরেজি নবিশরা যে কাণ্ডকারখানা করছিল, তাতে তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে এদেশের মর্যাদা ও পুরনো মূল্যবোধগুলোকে তুলে ধরার জন্য এই বইয়ে তিনি অতি যত্নে এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিপ্রদাস এবং দয়াময়ীর চরিত্র দুটি গড়ে তোলার একটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি মূলত সেক্যুলার মানবতাবাদী, সেহেতু দেখুন, তাঁর এত বড় শক্তিশালী কলম সত্ত্বেও যা সত্যি কথা বলতে কী যাদুকরের মতো চলে, অর্থাৎ চরিত্র যেমন তিনি গড়ে তুলতে চান, তেমন করে গড়ে তুলতে পারেন, তাও বিপ্রদাসকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কেমন যেন থিতিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কলম তেমন কাজ করছে না, যুক্তি তেমন খেলছে না। শুধু কতকগুলো কথা, কতকগুলো 'ডিক্টাম'-এর দ্বারা একটা আবহাওয়া, একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে বিপ্রদাসকে তিনি খাড়া করেছেন। তাঁর লেখার যে অমন রসঘন সাবলীল ভঙ্গি বিপ্রদাসের পক্ষে যুক্তি করার ক্ষেত্রে তা তেমন খেলেনি। অথচ যখনই দ্বিজদাসের চরিত্র তিনি এনেছেন তখনই তার রস, হিউমার উপচে পড়েছে। কাজেই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে রিভাইভ্যালিজমকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁর এই চেষ্টাটা একটা ব্যর্থ চেষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে। অতবড় ক্ষমতাশালী লেখক হওয়া সত্ত্বেও রিভ্যাইভ্যালিস্ট চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তাঁর হাতে পড়ে বিপ্রদাস ও বিপ্রদাসের মা — এই দু'টি চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। বস্তুত এই উপন্যাসে মহৎ হয়ে যারা ফুটে উঠেছে, তারা না বিপ্রদাস, না তার মা। শেষ পর্যন্ত দ্বিজদাস, বন্দনা ও তার আত্মভোলা বাবার চরিত্রই বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। এইভাবে বুঝলে বোঝা যাবে, চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ এই বইটিতেও তাঁর অজ্ঞাতসারেই প্রাধান্য পেয়েছে।

শরৎসাহিত্যে মনস্তত্ত্ব

শরৎ সাহিত্যের ভিতরে বহু নারী এবং পুরুষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে মনস্তাত্ত্বিক বিচিত্র সব দ্বন্দ্ব-সংঘাত এসেছে। কিছুদিন আগেই তাঁর 'বিন্দুর ছেলে' বইটা আবার পড়ছিলাম। তাতে বিন্দুর চরিত্রকে অদ্ভুতভাবে তিনি এঁকেছেন। সেখানে বিন্দুকে দেখবেন, সে মনে মনে চাইছে একরকম, ব্যবহার করছে আর একরকম, মুখ দিয়ে তার কথা বেরিয়ে যাচ্ছে আর একরকম। বড় জা'র সাথে তার মনের মিল রয়েছে, তাকে সে গভীরভাবে ভালবাসে, কিন্তু বলবার ভঙ্গির জন্য, শুধু প্রকাশভঙ্গিমার

জন্য তার অর্থ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। স্বামীর বোনের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পেরে যাকে মায়ের মতো ভালোবাসে, সেই বড় জাকে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে সে আঘাত করে। এই বড় জায়ের ছেলেকে বিন্দুই সন্তান হিসাবে মানুষ করছে। সেই ছেলে স্বামীর বোনের বখে যাওয়া ছেলের কুসংসর্গে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যেসব কথা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি, সে কথাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় — "কার পয়সা খরচ কর, সেটা দেখতে পাও না? কার রোজগারে খাচ্চ-পরচ সেটা জান না?"। এই কথা তার বড় জাকে মর্মান্তিক আঘাত করে। একজনের অপরাধে আরেকজনকে বিন্দু আঘাত করে বসল। এর ফলে যারা পরস্পর পরস্পরকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসে এবং একত্রে থাকতে চায়, সেই পরিবারও ভেঙে তছনছ হয়ে যায়, আর প্রবল অনুশোচনায় বিন্দু প্রায় মৃত্যুমুখী হয়। এই বিন্দুর চরিত্র তুলে ধরতে গিয়ে তিনি যে সমস্ত ঘটনার অবতারণা করেছেন, তার মধ্যে বহু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লুকিয়ে আছে। সেখানে বিন্দুর এক একটি আচরণ দেখিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে বিন্দু এইজন্য এটা করল, এর দ্বারা তার এই মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হল, বা এটা হল 'ট্রমা', এটা হল 'অ্যামবিভ্যালেন্স', ফ্রয়েড এ সম্বন্ধে এইরকম বলেছেন— এইরকম এক একটা চ্যাপ্টার তিনি যোগ করেননি, যেমন করে একদল করেন। আমি আগেই বলেছি, শরৎচন্দ্র মনে করতেন, এরকম করার তাঁর দরকার ছিল না। এটা না করে মনস্তত্ত্বের সমস্ত বিষয়ই তিনি সেখানে তুলে ধরেছেন। তিনি যদি সেখানে মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা এ'ভাবে দিতে যেতেন, তাহলে ঘরের বৌ-রা বা সাধারণ মানুষ যারা মনস্তত্ত্ব জানে না, তারা কিছুই বুঝত না। বরং এইভাবে বলাতে খানিকটা বুঝবে। আর, যারা মনস্তত্ত্ব যথার্থই জানেন, বই পড়ে তার ওপর শুধু কতকগুলো বড় কথা বলতে শেখেনি, তারা তো পড়লেই বুঝতে পারবেন। তাই মনস্তত্ত্বের 'টার্মিনোলজি' সাহিত্যে লেখার দরকার কী?

এই রকম কিরণময়ী, সতীশ, বিপ্রদাস, দয়াময়ী, সাবিত্রী, দিবাকর, কমল, আশুবাবু প্রভৃতি অসংখ্য চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোর মধ্যে কী কী মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা 'ট্যাকেল' করা হয়েছে, তা যাঁরা মনস্তত্ত্ব জানেন তাঁরা পড়লেই বুঝতে পারবেন। একমাত্র যাঁরা মনস্তত্ত্বের বই পড়ে সেই বই-পড়া কথাগুলোই মাস্টারমশাইদের মতো আবার বলেন, অথচ মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যথার্থ কোনও ধারণা নেই, তাঁরাই বুঝতে পারবেন না তার মধ্যে কী কী মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আছে। আর, সাধারণ মানুষ মনস্তত্ত্বের জটিল ব্যাখ্যার কচকচির মধ্যে না গিয়েও সাধারণ বিচারে তার মন থেকে বিভিন্ন চরিত্রের ভাল দিকগুলোকে বুঝবে এবং তার দ্বারা মনস্তত্ত্বের মূল কথা কিছুটা বুঝবে।

তত্ত্বের এইসব বড় বড় কথাগুলোই গল্পের মধ্য দিয়ে রস সৃষ্টি করে পাঠকের মনের মধ্যে শরৎচন্দ্র ঢুকিয়ে দিয়েছেন, বুদ্ধির দরজায় তিনি যাননি। তিনি একটা কথা

বুঝতেন যে, এইসব তত্ত্বকথা তো তত্ত্বের নানা বইতেই আছে। দর্শনের বইয়ে দর্শনের কথা রয়েছে, মনস্তত্ত্বের বইয়ে মনস্তত্ত্বের কথা রয়েছে, অর্থনীতির বইয়ে অর্থনীতির ব্যাপার রয়েছে, বিজ্ঞানের বইয়ে বিজ্ঞান রয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বইয়ে নানা সমস্যা রয়েছে— যুক্তিবিজ্ঞানের সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে। কিন্তু, অনেক সময় মানুষ সেগুলো পড়েও তত্ত্বের বা জ্ঞানের আসল কথাগুলো ধরতে পারে না। তাই তিনি জীবনকে কেন্দ্র করে যে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়, মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা গড়ে ওঠে, মানুষের মনে যে অনুভূতি এবং হৃদয়াবেগ জন্ম নেয়, তার ওপর ক্রিয়া করে সূক্ষ্ম রসের উপলব্ধি ঘটিয়ে এবং ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে, মানুষের মনে সেই যুগের বড় তত্ত্বগুলোই গেঁথে দিতে চেয়েছেন। বুদ্ধি দিয়ে পড়াশুনা করে যারা বুঝতে পারবে তারা তো পারবেই। কিন্তু, জনতার যে বিরাট অংশটা বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না— শিক্ষিতরাও পারে না অনেক সময়— তারা যাতে বুদ্ধির দরজায় হাত না পেতে রসের দরজা দিয়ে বড় তত্ত্বের হদিশ পেতে পারে, আর রসোপলব্ধির মাধ্যমে সত্যিকারের বড় জিনিসের হদিশ যদি কোনও মানুষ একবার পেয়ে যায়, তবে কিছু না বুঝেও সে খানিকটা পাল্টে যাবে। মেয়েরা 'এথিকাল মাদারহুড' কী — সে সম্পর্কে তত্ত্ব জানার অর্থে একটি কথাও না জেনে এথিকাল মাদারহুডের গুণাবলির দিকে আকর্ষিত হতে থাকবে। গল্পের মধ্য দিয়েই এই এথিকাল মাদারহুডের ধারণাকে কেন্দ্র করে যেসব চরিত্র গড়ে উঠেছে তাদের প্রতি পাঠকের ব্যথা-বেদনা জাগবে, তাদের সেইদিকে যাওয়ার প্রবণতা বাড়বে, বিন্দুর দিকে তাদের আকর্ষণ হবে, সাথে সাথে যাদবের দিকে তাদের আকর্ষণ হবে, মাধবকেও তারা বুঝতে চাইবে। এইভাবে এক একটা চরিত্র এঁকে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে এবং বড়ত্বকে পাওয়ার জন্য পাঠকের মধ্যে মানসিক অভাববোধ গড়ে তুলে তিনি সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পাতার পর পাতা ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর লেখাকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে চাননি।

শরৎচন্দ্র সাহিত্যশিল্পকে, বাক্যবিন্যাসের ভঙ্গিমাকে, রসবোধকে যে স্তরে উন্নীত করেছিলেন, আধুনিক সাহিত্যকে তার থেকে আরও 'প্রিসাইজ' (precise), আরও উন্নত ধরনের হতে হবে। এই আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃতি কী হবে তার ইঙ্গিত দিতে গিয়ে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, তা বর্ণনার বাহুল্যবর্জিত যুক্তিধর্মী ডায়ালগ হবে, 'প্রিসাইজ' হবে, বিজ্ঞানসম্মত হবে — তবেই তা আরও বেশী রসোত্তীর্ণ এবং রসগ্রাহী হবে। এজন্য তিনি বলতে চেয়েছেন, শিল্পী যেমন করে বলতে চায় তেমন করে বলতে পারা যেমন শিল্পপ্রতিভা, আবার বলবার লোভ সম্বরণ করতে পারাও শিল্পীর একটা বড় প্রতিভা। এটিও তার দরকার।

তাই শরৎচন্দ্র তৎকালীন সময়ে সাহিত্যিকদের উদ্দেশে একটা কথা

বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, লিখতে পারাটাই বড় কথা নয়। কেউ যদি সাহিত্যিক হয়ে পাণ্ডিত্য জাহির করতে, নিজে কত জানেন তা ব্যাখ্যা করতে বসে যান, তাহলে আর যাই হোক, তা সাহিত্য হবে না। লিখতে পারা যেমন একটা গুণ, সময়মতো থামতে জানাও একটা গুণ। সব কথাই যদি সাহিত্যিক বলে দেন, পাতার পর পাতা যদি তিনি নিজেই কেঁদে যান, তাহলে পাঠককে তো তিনি কাঁদার অবসরই দিলেন না। তিনি নিজেই এত কেঁদে গেলেন যে, পাঠকের যদি কোনও সময় কান্না এসেও থাকে তা শুকিয়ে গেল। এসব করে কোনও রসিক লোককে কাঁদানো যায় না। গল্প এমনভাবে বলতে হবে, ব্যথা-বেদনার কাহিনীগুলো এমনভাবে উপস্থাপনা করতে হবে, যাতে একটাও কান্নার কথা থাকবে না, অথচ গল্প পড়তে পড়তে লোক কাঁদবে, তবে তো সূক্ষ্ম রসবোধ বা অনুভূতি আসবে। কথায় কান্না নেই, কথাটা হাসির, কথাটা একটা 'হিউমার' — অথচ পড়তে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়। লেখার এমন ক্ষমতা থাকা চাই এবং এরকম করে লেখার ক্ষমতাই হচ্ছে সাহিত্য। সেইজন্য 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে দেখবেন, যেখানে দিবাকরের লেখা একটা গল্প সম্পর্কে 'অহোঃ কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য' বলে কাগজে খুব তারিফ হয়েছে, সেখানে কিরণময়ী তাই নিয়ে তাকে ঠাট্টা করছে। কারণ, রসসাহিত্যের কোনও ধারার মধ্যেই এগুলো পড়ে না। একদল লোক আছে যারা আবার এগুলো পড়তে পড়তেই কাঁদে, কারণ, পাতায় পাতায় কান্নার ফিরিস্তি আছে।

এর কারণ নিম্নরস বলেও একটা কথা আছে, আবার উচ্চরস বলেও একটা কথা আছে। যেমন চার্লিও হাসায়, আবার এখানকার কিছু কিছু কমেডিয়ানও হাসায়। এই দু'টো কি এক জিনিস নাকি? বড়দের 'কমিক' তো সেইগুলোই, যেখানে মানুষকে সূক্ষ্ম রসের অনুভূতিতে হাসানো যায়। কেউ যদি ভাঁড়ামি করে মানুষকে হাসাবার চেষ্টা করে, আর মানুষও যদি সেই ভাঁড়ামি দেখে হাসতে থাকে, তাহলে তো বুঝতে হবে তার রসবোধ ভাঁড়ের স্তরে রয়েছে। তা না হলে সে হাসে কী করে? যে সাহিত্যে বিন্দুমাত্র রস নেই, সেই সাহিত্য পড়েই যদি মানুষ রস আস্বাদন করতে থাকে তাহলে তা কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে, যে রসের মানটা মানুষের ছিল, তা নেমে গিয়েছে। আর, রসের মানটা যদি নেমে যায়, তাহলে তাকে দিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলানো যেতে পারে, কিন্তু তার আচরণ হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম। খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষকেও, অতি রুচিবান মানুষকেও হাসিয়ে দেওয়া যায় উচ্চ রস সৃষ্টি করে এবং এই উচ্চ রস বোঝার ক্ষমতাটা আয়ত্ত করার জন্য সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিকে স্তরে স্তরে পর্দায় পর্দায় ওঠাতে হয়। এই কাজটি করেন সাহিত্যিক। সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে নিম্নরস থেকে মানুষকে ধীরে ধীরে এই উচ্চরসের পর্দায় নিয়ে যাওয়া। তার জন্য সূক্ষ্ম রসের অনুভূতিতে, হিউমারে,

রসবোধে তাকে কাজ করতে হবে। এইদিক থেকে শরৎচন্দ্রর ক্ষমতা ছিল অতুলনীয়।

নরনারীর ভালবাসার ভিত্তি দৈহিক সম্পর্ককে শিল্পের উঁচু পর্দায় বেঁধেছেন

প্রবৃত্তির আবেদনকে তিনি সাহিত্যে প্রাধান্য দেননি। বলেছেন, নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে ওটা তো আছেই। যেমন, একটা ছোট কথায় আপনাদের কাছে বলি। মানুষ আদিম অবস্থায় উলঙ্গ ছিল। সেই মানুষ নিজেকে জামাকাপড় পরিয়েছে, নারীকে নানা বেশভূষায় ভূষিত করেছে। তেমনি নরনারীর বিবাহিত যৌন জীবনে দেহের আবডাল কিছু থাকে না, এটা সকলেই জানে। কিন্তু, যৌনজীবন রুচি মিশ্রিত হয়েছে বলে, শুধু যৌন উত্তেজনা নয়, রুচির এই আবডালটায় তা আরও সুন্দর এবং রসঘন হচ্ছে। সভ্যতার বিকাশ মানুষের মনকে আরও সমৃদ্ধ, আরও রসঘন করেছে। দেহের সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে তার উপভোগ যাতে আরও আনন্দময় হতে পারে তারই জন্য তার ওপরে মানুষ স্টাইল অর্থে, আর্ট অর্থে রুচির এই আবডাল স্বেচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্টি করেছে। জামাকাপড় ফেলে দিয়ে তাকে উলঙ্গ করেনি। একে উলঙ্গ করছে তারাই, যারা বিকৃতমনস্ক, যাদের অন্য কোনওভাবে আনন্দ পাওয়ার উপায় নেই, একমাত্র নিজেদের উত্তেজিত করা ছাড়া। আর উত্তেজনা শেষ হয়ে গেলেই তারা ক্লান্ত, তারপরেই বেড পিল খেয়ে তাদের ঘুমোতে হয়।

শরৎচন্দ্র বলছেন, নরনারীর ভালবাসার সম্পর্কের মধ্যে যেটা স্টাইল, যেটা তার সাংস্কৃতিক দিক, যেটা মনের দিক, রুচির দিক, আদর্শের দিক, নীতিনৈতিকতা-মূল্যবোধের দিক — সেগুলোকে কেন্দ্র করে, তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং মান-অভিমানকে কেন্দ্র করে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাতেই তো দৈহিক সম্পর্ক আরও রসঘন হয়। না হলে প্রতিটি ভালবাসার পেছনে যে দেহ আছে, তা তো সকলেই জানে। তাকে উলঙ্গ করে প্রকাশ করার মধ্যে কি তার সৌন্দর্য বিকশিত হয়? নাকি, তার সৌন্দর্য মার খায়? যারা ভালবাসার এ ছাড়া আর কোনও সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে না, তারাই কেবলমাত্র ভালবাসার এই উত্তেজনার দিককে ফেনিয়ে ফেনিয়ে প্রকাশ করাকে সৌন্দর্য বলে বাজারে চালাতে চাইছে। আর, তারাই বলছে শরৎসাহিত্যে দৈহিক প্রয়োজনকে অস্বীকার করা হয়েছে। শরৎচন্দ্র নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে, ওটা কি আবার একটা লেখার বিষয়? সেগুলো যদি আমি পরপর লিখি এবং এমনভাবে লিখি যাতে পড়তে পড়তে পাঠকের উত্তেজনা হয়, আর তারই সঙ্গে দু'টো কাব্যকথা মিলিয়ে দিই, তাহলেই কি তা সুন্দর হবে? শিল্পীর 'মডেল'-এ যা সৌন্দর্য, রাস্তাঘাটে কি তা সৌন্দর্য? তা কি সৌন্দর্যকে বিকশিত করে, না কলুষিত করে? তেমনি সাহিত্যের দরবারে ভালবাসার ক্ষেত্রে নরনারীর সম্পর্কের

উলঙ্গ প্রকাশ কি সৌন্দর্যকে উদঘাটিত করে, না কলুষিত করে? এই ছিল শরৎচন্দ্রের বক্তব্য।

আর, এইসব সমালোচকরা বলছেন, শরৎচন্দ্র ছিলেন 'সম্ভোগবিরোধী' এবং 'নীতিবাগীশ'। আবার তখনকার দিনের নীতিবাগীশ গোঁড়া হিন্দু সমাজ তাঁকে বলত 'ব্যাভিচারী'। এই দুই দলই খুব প্রাজ্ঞ! যাঁরা তাঁকে নীতিবাগীশ বলেছেন, তাদের অভিযোগ হচ্ছে — ভালবাসার যেটা মূল কেন্দ্রবিন্দু তাকেই তিনি আমল দেননি। অর্থাৎ, ভালবাসা যখন যৌনক্রিয়া এবং শারীরিক আদানপ্রদানে পর্যবসিত হয়, তখন ছেলেমেয়েরা কী করে তা রসিয়ে রসিয়ে পর্ণোগ্রাফি করে তিনি লেখেননি। শরৎচন্দ্র বলছেন, নমস্কার, এত দুর্দশা আমার ঘটেনি যে, একটা ভালবাসা বোঝাবার জন্য এই অপকর্ম আমাকে করতে হবে। কারণ, তাঁর ক্ষমতা এর চাইতে অনেক বড় ছিল। তিনি ইঙ্গিত আকারে তা বুঝিয়েছেন এবং অত্যন্ত সুন্দর করে বুঝিয়েছেন।

যে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এইসব সমালোচকরা বলছেন যে, তিনি দেহকে আমল দেননি, সেই শরৎচন্দ্র তাঁর 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে এ সম্পর্কে কী বলছেন দেখুন। সেখানে দিবাকর কিরণময়ীকে একজায়গায় প্রশ্ন করছে যে, "বৌদি, নারীর এই রূপ জিনিসটা আসলে কী? আর ভালোবাসাই বা তার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকে কেন?" ডায়ালগ-এর মাধ্যমে কিরণময়ীর মুখ দিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে শরৎচন্দ্র এর উত্তর করেছেন। বলছেন, "... সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সবচেয়ে উপযোগী তাই নারীর রূপ। সমস্ত জগতের সাহিত্যে, কাব্যে এই বর্ণনাই তার রূপের বর্ণনা। ... এইজন্যই নারীর বাল্যরূপ যদি বা মানুষকে আকৃষ্ট করে, তাকে মাতাল করে না। আবার যেদিন সে সন্তান-ধারণের বয়স পার হয়ে যায়, তখনও ঠিক তাই। ভেবে দেখ ঠাকুরপো, শুধু নারী নয়, পুরুষেরও এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ, যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করার ক্ষমতাই তার রূপযৌবন, এই সৃষ্টি করার ইচ্ছাই তার প্রেম।" এখানে শরৎচন্দ্র দৈহিক সম্পর্কের সঙ্গে প্রেমের ওতপ্রোত সম্পর্ককে পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন। নারীর যে সৌন্দর্যের কথা এখানে তিনি বলেছেন, তা হচ্ছে নারীর দেহগত সৌন্দর্য, নারীর গুণের যে রূপগত দিক, তা নয়। নারীর এই দেহগত রূপ কী, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলছেন, এর আসল কথা হচ্ছে নারীর সন্তানধারণের ক্ষমতা। সন্তানধারণের উপযুক্ত লক্ষ্মণগুলোর সমাবেশ বা উপস্থাপনাই হচ্ছে নারীর রূপ। এখানে কোনও ফাঁকি নেই। এখানে প্লেটোনিক বা ঐশ্বরিক ভালবাসার কথা বলে ফাঁকি দিতে গেলে নিজেকেই ঠকাতে হবে।

তাঁর এইসব কথাই প্রমাণ করে যে, দেহকে তিনি অস্বীকার করেননি। শুধু দেহ নিয়ে তিনি মাতলামো করেননি। তিনি দেহের সীমা কোথায়, দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক কী, মনের আধিপত্য দিনের পর দিন কীভাবে দেহের ক্রিয়ার ওপর

প্রভাব বিস্তার করে, এইগুলো দেখাবার চেষ্টা করেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় শরৎচন্দ্র আমাদের মনকে ছেয়ে ছিলেন। তখন আমরা শরৎসাহিত্য সত্যিই অনুরাগের সঙ্গে পড়েছি। এখনও সময় পেলেই ফাঁকে ফাঁকে কিছু পড়ার চেষ্টা করি। তাই কিছু কিছু সংলাপ আজও মনে গাঁথা হয়ে আছে। 'শ্রীকান্ত'-র চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মী একজায়গায় শ্রীকান্তকে বলছে, "তোমাকে কি বিনামূল্যে অমনি অমনিই নেব - তার ঋণ পরিশোধ করবো না? আর আমিও যে তোমার জীবনে সত্যি করে এসেছিলুম, যাবার আগে সেই আসার চিহ্ন রেখে যাব না? এমনিই নিস্ফলা চলে যাব? কিছুতেই তা আমি হতে দেব না।" — এই কথার মধ্যে কী ইঙ্গিত লুক্কায়িত আছে? পাকশালার লোকদের জন্য? না, বিদ্বজ্জনের জন্য? আর, এ কেমনতর বিদ্বজ্জন, যারা এই কথার পিছনে কী ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে এবং কেমন শিল্পসম্মত উঁচুমানের পর্দায় তাকে বলা হল, তা ধরতে পারে না? এর ভাবভঙ্গিমা এবং প্রকাশভঙ্গিমা এমন যে, খুব উঁচুদরের রসিক লোক না হলে এর পেছনকার কথাটা কী, অর্থাৎ তিনি কি বলতে চাইলেন তা ধরতে পারবেন না। তাহলে দেহকে কে এখানে অস্বীকার করেছে? এই বইয়েরই আর এক জায়গায় দেখবেন, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বলছে, "কাল কথা কইতে কইতে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আমার গলার ওপর থেকে তোমার হাতখানি সরিয়ে রেখে আমি উঠে বসলুম। ... ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা অল্পে ভাঙে না, নইলে লোভের বশে তোমায় জাগিয়ে ফেলেছিলুম আর কি" —বলেই ইতি।

শরৎচন্দ্র নিজেই বলছেন, শুধু লিখতে পারাই সাহিত্যক্ষমতা নয়। সময়মত লেখনী সংযত করা বা থামতে পারাও সাহিত্যিকদের একটা ধর্ম এবং ক্ষমতা। ঠিক কোন জায়গাটায় থামলে তা আরও রসঘন হবে এবং উঁচুমানের রস সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে, সেটা বোঝা দরকার। নিচুমানের রসিক লোকদের কাছে তো রাজলক্ষ্মী কী করল, তা নেড়েচেড়ে বলে না দিলে আর রসগ্রাহী হবে না। অথচ, সত্যিকারের রসগ্রাহীদের তা পড়তে গিয়ে মাথার চুল একেবারে খাড়া হয়ে যাবে। তাদের কাছে এ এক বিপজ্জনক কারবার। শরৎচন্দ্র উন্নত রুচিসম্মত সূক্ষ্ম রসের কারবার করেছেন, স্থূল রসের কারবার করেননি।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে তিনি স্বামী কর্তৃক অবহেলিত, লাঞ্ছিত এক বলিষ্ঠ নারী চরিত্র অভয়াকে চিত্রিত করে দেখালেন, কীভাবে সে অপরের ভালবাসার মর্যাদা দিয়ে তাকে গ্রহণ করে। অভয়ার স্বামী নিষ্ঠুর, কদাচারী, মিথ্যাবাদী, স্ত্রীকে দেশে ফেলে রেখে কোনও যোগাযোগ না রেখে বর্মায় অন্য স্ত্রী নিয়ে ঘর করছিল। অভয়া তারই কাছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বর্মায় এল, সঙ্গী গ্রামের যে রোহিনী দাদা তাকে ভালবাসে তাকে নিয়ে। স্বামীর কাছে কী ব্যবহার পেয়েছে সে সম্পর্কে অভিযোগ জানিয়ে সমগ্র হিন্দু সমাজকে, তার বৈদিক মন্ত্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে

দিল। অভয়া শ্রীকান্তকে বলছে, "স্বামী যখন শুধুমাত্র একগাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তারপরেও বিবাহের বৈদিক মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কি না, আমি সেই কথাই তো আপনার কাছে জানতে চাইছি। ... তিনিও তো আমার সঙ্গে সেই মন্ত্রই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু একটা নিরর্থক প্রলাপের মত তাঁর প্রবৃত্তিকে, তাঁর ইচ্ছাকে তো এতটুকু বাধা দিতে পারল না, অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল শুধু মেয়ে মানুষ বলে আমারি উপরে? ... যার স্বামী এতবড় অপরাধ করেচে তার স্ত্রীকে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে সারাজীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকাই তার নারীজন্মের চরম সার্থকতা? ... আর আমার পত্নীত্বের অধিকার নেই, আমার মা হবার অধিকার নেই, — সমাজ, সংসার, আনন্দ কিছুতেই আর আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই? একজন নির্দয়, মিথ্যাবাদী, কদাচারী স্বামী বিনাদোষে তার স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিলে বলেই কি তার সমস্ত নারীত্ব ব্যর্থ, পঙ্গু হওয়া চাই? ... রোহিনীবাবুকে তো আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা তো আপনার অগোচর নেই, এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিয়ে আর আমি সতী নাম কিনতে চাইনে। ... একটা রাত্রির বিবাহ অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হয়ে গেছে, তাকে জোর করে সারাজীবন সত্য বলে খাড়া রাখবার জন্যে এই এত বড় ভালবাসাটা একেবারে ব্যর্থ করে দেব? ... আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানরা মানুষ হিসাবে জগতে কারও চেয়ে ছোট হবে না — এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়ত কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেচে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না।" যে শরৎচন্দ্র এই অভয়া চরিত্র সৃষ্টি করেছেন এবং যে ঘটনার ব্যাকগ্রাউন্ডে তাকে দিয়ে যেসব কথা বলিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে এইসব সমালোচকরা কী বলবেন? এরপরও কি বলবেন তিনি রক্ষণশীল ছিলেন?

শরৎচন্দ্র ও কল্লোলযুগ

রবীন্দ্রনাথ যখন কল্লোলযুগের লেখকদের বিরুদ্ধতা করেছিলেন, তখন তাদের সমর্থনে কলম ধরলেন শরৎচন্দ্র। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার উত্তরে বললেন, এদের ভিতরে লেখার ক্ষমতা আছে, সম্ভাবনা আছে। এরা যদি আমাদের রাস্তা ছেড়ে চাষি-মজুর-নিচুতলার মানুষগুলোর মধ্যেই ঢোকে, তাদের দুঃখ-ব্যথার

জীবনকাহিনী সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে চায়, তাহলে তা নিয়ে কি শিল্পসাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না? এইভাবে কল্লোলযুগের লেখকদের সপক্ষে তিনি লিখেছেন। কিন্তু, তারা যখন কিছুদিন পর 'ন্যাচারালিজম'-এর নামে বাড়াবাড়ি শুরু করলেন, তিনি কল্লোলযুগের লেখকদের একটা কথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তা হচ্ছে, সাহিত্যে সূক্ষ্ম রস পরিবেশনই হচ্ছে বড় কথা। অথচ, জীবন চিত্রিত করার নামে তারা যে নগ্ন পর্ণোগ্রাফির চর্চা করছেন, তাতে সাহিত্যের সেই রস এবং শিল্পই মরে যাচ্ছে। আর একটা কথা তিনি তাঁদের বলতে চেয়েছেন, তা হচ্ছে, বাস্তব সাহিত্যের নামে নরনারীর যে যৌনজীবন নিয়ে তাঁরা মাতামাতি করছেন, সেটা মানুষের সমস্ত দিকের মধ্যে একটা দিক। তাঁরা শুধু এই দিকটা নিয়েই সাহিত্য রচনা করছেন। তাঁদের সামনে স্বাধীনতার লড়াই হচ্ছে। অথচ, তাঁদের লেখায় তার কোনও আবেদন নেই। তা নিয়ে কোনও যন্ত্রণা, কোনও ব্যথা তাঁদের মধ্যে নেই। তাঁরা বাস্তব সাহিত্য রচনা করতে চাইছেন। কিন্তু, মানুষের যৌনতা ছাড়া কি আর বাস্তবতা কোথাও বিরাজ করে না? দেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটা কি অবাস্তব? বলেছেন, "...বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে পাও না। মানবজীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এসব রয়েছে, এর বেদনা কি তোমরা অনুভব কর না? ... এর অভাব বেদনা কি তোমাদের লাগে না? এরজন্য প্রাণটা কাঁদে না কি?" যৌনতা নিয়ে বাড়াবাড়ি সম্পর্কে তিনি কল্লোলযুগের সাহিত্যিকদের আরও বলেছিলেন, "... আর্ট জিনিসটা মানুষের সৃষ্টি, নেচার নয়। সংসারে যা কিছু ঘটে, তা কিছুতেই সাহিত্যের উপাদান নয়। ... দৈনিক খবরের কাগজে অনেক কিছু রোমহর্ষক ভয়ানক ঘটনা ছাপা হয়ে থাকে, সে কি সাহিত্য? ... নরনারীর যৌন মিলন সকল রস-সাহিত্যের ভিত্তি ... ভিত্তির মত ও-বস্তুটি সাহিত্যের গভীর ও গোপন অংশেই থাক। বনিয়াদ যত নীচে এবং যতই প্রচ্ছন্ন থাকে, অট্টালিকা ততই সুদৃঢ় হয়। ততই শিল্পীর ইচ্ছামত তাহাতে কারুকার্য করা চলে। গাছের শিকড় গাছের জীবন ও ফুল-ফলের পক্ষে যতই প্রয়োজনীয় হউক - তাহাকে খুঁড়িয়া উপরে তুলিলে তাহার সৌন্দর্যও যায়, প্রাণও শুকায়।" কী সুন্দর উপমা দিয়ে তিনি এক অমূল্য শিক্ষা দিলেন। তারপর তাদের সতর্ক করে বললেন, "এই সত্যটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাহিত্য রচনায় আর যাই হোক না কেন শ্লীলতা, শোভনতা, ভদ্র রুচি, মার্জিত মনের রসোপলব্ধিকে অকারণ দাম্ভিকতায় বারম্বার আঘাত করতে থাকলে বাংলা সাহিত্যের যত ক্ষতিই হোক, তাদের নিজেদের ক্ষতি হবে তার চেয়েও অনেক বেশি। সে আত্মহত্যারই নামান্তর।" এদের এসব দেখে গভীর উদ্বেগে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁর নিজেরও বয়স হয়েছে, ফলে তাঁরা যখন থাকবেন না, তখন বাংলা সাহিত্যের মান নেমে যাবে। এক চিঠিতে শিল্পী দিলীপ রায়কে লিখেছিলেন, আধুনিক সাহিত্য কেমন হওয়া উচিত, তারই নমুনা হিসাবে 'শেষ প্রশ্ন' লিখেছেন।

শেষ প্রশ্ন — ভালোবাসার স্বাধীনতা ও নারীর আত্মমর্যাদা

'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসটিতে তিনি বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রথম যুগে ভালবাসার স্বাধীনতা সম্পর্কে তখনকার সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে বিপ্লবাত্মক ধারণা গড়ে উঠেছিল, সেই রূপটিই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লববাদের স্বাধীনতার এই রূপটিই একদেশদর্শী। বুর্জোয়া বিপ্লববাদের এই একদেশদর্শিতা পরবর্তী সময়ে মানুষের নৈতিকতা, আদর্শবোধ এবং সামাজিক দায়িত্বের সাথে তার প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি এগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করতে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করেছে এবং আজও করে চলেছে। যে কথা লেনিনকেও পরবর্তী সময়ে বলতে হয়েছে বা অন্যদেরও বলতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে দেখিয়েছেন ভালবাসার স্বাধীনতার ওপর একতরফা অযথা জোর দিলেই ভালবাসার স্বাধীনতার স্বীকৃতি হয় না। এই ভালবাসাকে যেমন একজায়গায় ধরে রাখা যায় না, তার যেমন প্রবল রূপভেদ আছে, আবার প্রতিমুহূর্তে লোক পাল্টানো মানেই যে সত্যিকারের ভালবাসা নয়, এও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, স্বামী পরিত্যাগ করতে পারাটাই আর ডিভোর্সের মামলা করতে পারাটাই নারী স্বাধীনতা নয়। নারীর এই কাজটাও যে নারীত্বের কত বড় মর্যাদার ভিত্তিতে করা যায়, তা দেখাবার জন্য শেষ প্রশ্নে কমলের পাশাপাশি তিনি বেলার চরিত্র এনেছেন। সেখানে বেলার প্রসঙ্গে আশুবাবু একজায়গায় কমলকে বলছেন, বুঝলে কমল, তুমি খুব পছন্দ করবে এমন একজন মহিলাকে তোমাকে দেখাব। আশুবাবু ধরেই নিয়েছেন, যেহেতু কমল নারী স্বাধীনতা চায় এবং নারীর স্বাধীনতার জন্য এবং ভালবাসার স্বাধীনতার জন্য সমাজের পুরনো সংস্কারের বিরুদ্ধে সে লড়ছে, সেহেতু যে বেলা হিন্দু সমাজের মধ্যে বাস করে স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা করেছে, তাকে দেখলে কমল খুব খুশি হবে। আশুবাবু তার নিজের ঔদার্য ও মহত্ত্বের জন্য, বিশেষ করে বেলা যেখানে ডিভোর্স চেয়েছে সেখানে আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে ন্যায়নীতি ও মানবতার ধারণা থেকে তিনি তাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু, রুচির অর্থে বেলার এই ডিভোর্সের চিন্তাটা যে একটি নীচজাতীয় ক্লীব চিন্তা, সেটা কমল কাহিনী শুনেই বুঝতে পেরেছে। কারণ বেলা তার যে স্বামীকে হেনস্থা করে ডিভোর্স করেছে, আবার তার কাছ থেকেই খোরপোষ চেয়ে বসে আছে। তার কথা হচ্ছে, "তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, ডিভোর্স হয়েছে যখন, তখন আমাকে খোরপোষ দেবে না কেন?" আজকেও সাধারণ নারীত্বের গর্ব করে এমএ পাশ, বিএ পাশ মেয়েরা এসব বলছে। এইসব তথাকথিত স্বাধীনচেতা নারীরা সহজ বুদ্ধিতে এই সাধারণ কথাটা বোঝে না যে, বিয়ে তো শুধু সে আমাকে করেনি, আমিও তো তাকে করেছি। খাওয়াতে হলে সে শুধু আমাকে খাওয়াবে কেন, আমিও তো তাকে খাওয়াব। যদি কেউ যথার্থ স্বাধীনচেতা, শিক্ষিতা এবং নারীত্বের অধিকারিনী হয়, নারীত্বের যদি বিন্দুমাত্র

মর্যাদাবোধ তার থাকে, তাহলে কি কোনও মেয়ে বলতে পারে যে, আমাকে বিয়ে করেছ যখন, তখন খাওয়াবে না কেন? সাধারণ লেখাপড়া না জানা পুরানো সমাজের মেয়েরা এভাবে ভাবতে পারে। তাদের আমি দোষ দিই না, কারণ, এইভাবে ভাবতেই তাদের অভ্যস্ত করা হয়েছে। তাদের নারীত্বকে চেপে রাখা হয়েছে। কিন্তু যারা লেখাপড়া শিখেছে, যারা গণতন্ত্র ও সমানাধিকারের কথা বলে থাকে, তারা পর্যন্ত এইভাবে চিন্তা করে। স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করছে, তারা পর্যন্ত এইভাবে ভাবনা-চিন্তা করে থাকে। আজকের দিনের বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের মধ্যেই ভালবাসা কী, স্নেহমমতা কী, আত্মমর্যাদাবোধ কী, নারীত্বের মূল্য এসব সম্পর্কে কোনও ধারণা গড়ে ওঠেনি কেন? অথচ, এত তো সংস্কৃতির জয়ডংকা বাজানো হচ্ছে, শ্রমিক আন্দোলন-চাষি আন্দোলনের পটভূমিকায় তথাকথিত প্রগতিশীল নাট্য আন্দোলনেরও তো বন্যা বইছে। বড় বড় কথা আমাদের দেশে কম লেখক বলেছেন কি? কিন্তু, শরৎসাহিত্য ঠিকভাবে বুঝতে পারলে চিন্তা-ভাবনার মোড় পাল্টে যাবে। কারণ, এখানে রুচি-সংস্কৃতির কতকগুলো বড় বড় কথা বক্তৃতার মতো করে না বলে, সেই বড় কথাগুলোই গল্প সৃষ্টি করে রসের মাধ্যমে ডায়ালগ করে করে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা পড়লে মানুষের মানসিক কাঠামো আপনিই পাল্টে যাবে। প্রত্যেকে বুঝবে মর্যাদা হারিয়ে কিছু পাওয়ার মধ্যে মনুষ্যত্ব নেই। নারীরাও এইভাবে ভাববে। খাওয়া পরা, সুখসম্পদ, যৌনজীবন, ভালবাসা, স্নেহ-প্রীতি-মমতা সবই মানুষের জীবনে দরকার। কিন্তু, নারীই হোন, আর পুরুষই হোন—মর্যাদা হারিয়ে যিনি এগুলো পেলেন তাঁর আর রইল কী? এইসব বোধগুলো সমাজজীবনে একেবারে মরে গেছে। শরৎচর্চা এই বোধগুলো ফিরিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

অথচ দেখুন, শেষ প্রশ্নে যে শিবনাথ ছলনার আশ্রয় নিয়ে কমলকে ঠকাল, সেই শিবনাথের এতটুকু অপমান বা গ্লানি সে অন্যদের করতে দিল না, এবং তার হয়ে যারা শিবনাথের বিরুদ্ধে লড়তে চাইল তাদের লড়তেও দিল না। বলল, তাহলে আমি লজ্জায় মাথা তুলতে পারব না। কাজেই কমলের মধ্য দিয়ে তিনি একটা ভিন্ন জাতের নারী চরিত্র এবং নারীর মর্যাদাবোধের একটা ভিন্ন ধারণা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। আবার এরই সাথে সাথে কমলের একদেশদর্শিতার দিকটা দেখাবার জন্য রাজেনকে এনে খাড়া করেছেন। এই ধরনের চিন্তা কিন্তু আমরা অতীতের মানবতাবাদী সাহিত্যে পাব না, রেনেসাঁস যুগের সাহিত্যে পাব না, পাব একমাত্র শরৎ সাহিত্যে।

এই উপন্যাসে একজায়গায় রাজেন কমলকে বলছে যে, হরেন্দ্রর আশ্রম ছেড়ে সে চলে যাবে। সে বলছে, "তাদের সঙ্গে আমার মতেও মেলে না, কাজের ধারাতেও মেলে না। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে"। তখন কমল বলছে, "এর চেয়ে

আর বড় কী আছে রাজেন? মন যেখানে মিলেছে, থাক না সেখানে মতের অমিল। হোক না কাজের ধারা বিভিন্ন। কি যায় আসে তাতে? সবাই একই রকম ভাববে, একই রকম কাজ করবে — তবেই একসঙ্গে বাস করা চলবে - এ কেন? আর পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল তো সে কিসের শিক্ষা''? কমলের প্রশ্নের উত্তরে রাজেন বলছে, ''মনের মিলটাকে আমি তুচ্ছ করি না। কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করাও হয়েছে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। ... ... সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি। এটা ভুল।'' দেখুন, যে কমল শেষ প্রশ্ন উপন্যাসে তার অকাট্য যুক্তিতে একে একে সবাইকে পরাজিত করল, তাকে রাজেন কেমন জোর চেপে ধরেছে, জোরালো যুক্তি তর্ক করছে। বলছে, এ একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। কমলের যুক্তি হচ্ছে, যেন মনই সব — অনুষ্ঠান, মত এগুলি কিছুই নয়। সে কমলকে উত্তর করছে, 'আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্ত বড় শিক্ষা বলছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায় না।' ব্যস, কমল চুপ। আর জবাব নেই। কমল যেখানে বলছে, শিক্ষার কোনও মূল্যই নেই যদি বিরুদ্ধ মতকে শ্রদ্ধা করতে না পারা যায়, সেখানে রাজেন বলতে চাইছে শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ মতকে সহ্য করা যায়, বরদাস্ত করা যায়। কিন্তু অপরের মতকে শ্রদ্ধা করতে সেই পারে যার নিজের মতের কোনও বালাই নেই। যেটাকে আমরা বলি বিরুদ্ধ মতের প্রতি 'ফিলজফিক্যাল টলারেন্স'। তাঁর বক্তব্য সেই চিন্তার কত কাছাকাছি।

আবার সে বলছে, মনের মিলটাই সব নয়। বাইরের অনুষ্ঠানটাও অনেকখানি। তাই তার কমলের কাছে বক্তব্য হল — এই যে শিবনাথ এবং কমলের এতবড় একটা ভালবাসা এত সহজে চলে গেল, তা হয়তো বাইরের অনুষ্ঠানটা মিথ্যা ছিল বলেই। সে কমলকে বলছে, ''আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলটাকেই একমাত্র সত্য স্থির বলে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গরমিলটাকে কিচ্ছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।'' অর্থাৎ, সে বলতে চাইছে, এই মিথ্যা থাকার ঘটনাটারও ভালবাসা চলে যাওয়ার পিছনে অবদান আছে। কারণ, তার একটা ভূমিকা আছে। আবার অনুষ্ঠানটি ঠিক মতো হলেও যে ভালবাসা চলে যেতে পারত না, তা নয়। কিন্তু এই ভালবাসা চলে যাওয়ার পিছনে অনুষ্ঠানটি না হওয়ার একেবারে কোনও অবদানই ছিল না — একথাও বলা চলে না। এরপর রাজেন তার মতো যুক্তি করে বলছে যে, ''কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে? আমার চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য — ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই।'' এটা হল এক ধরনের যান্ত্রিক বস্তুবাদী

চিন্তা।

শরৎচন্দ্র পুরনো কূপমণ্ডুকতা ও ধর্মান্ধতা, নীতি অনুশাসনের মধ্যে চিরস্থায়ী করে পাওয়ার চেষ্টার এই ধরনের মানসিকতাগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তিধারাকে খেলিয়ে কমলকে অতি যত্নে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কমলের চরিত্রকে খাড়া করে হিন্দুধর্মের নৈতিকতা ও প্রচলিত যুক্তিবাদের ওপর শরৎচন্দ্র কুঠার হানলেন এবং তার বিভিন্ন দিকগুলো দেখালেন। পরিষ্কার করে বললেন, "কোন দেশেই মানুষের পূর্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তাহলে সৃষ্টি থেমে যেত। এর চলার আর কোন অর্থ থাকত না।" কমলকে তিনি কলুষিত করেননি। বরং কমলকে যারা কলুষিত করতে চেয়েছে, শেষ পর্যন্ত তারাই ছোট হয়ে গিয়েছে। অথচ, ন্যায়নীতির ছক কাটা কোনও বাঁধনের মধ্যে তাকে নিয়ে যাননি। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'শেষের কবিতা'য় ভালবাসাকে এভাবে রক্ষা করতে পারলেন না। সেখানে নিত্যপ্রয়োজনে অর্থাৎ মশলাবাটার প্রয়োজনে বিয়ে করতে হল অপরকে। আর, যাকে সত্যিকারের ভালবাসল তাকে বিয়ে করা চলল না। কারণ, বিয়ে করলে যদি বাঁধন ছিড়ে যায়। আর শরৎচন্দ্র বলেছেন, ভালবাসা শাশ্বত নয়, তারও জন্ম-মৃত্যু আছে। তা ছিঁড়তে পারে, আর নাও ছিঁড়তে পারে। কোনও দিন ছিঁড়ে যেতে পারে বলে, আজ সত্যকে অস্বীকার করব—এ দুর্বলতা। আবার ভবিষ্যতে তা কোনওদিন ছিঁড়ে গেল বলে আমার এখনকার ভালবাসা অসত্য ছিল, কম গভীর ছিল বা কম মূল্যবান ছিল, তাও নয়। ছেঁড়বার আগে যে ভালবাসায় টগবগ করছিলাম তাও সত্য ছিল, আবার আজ যখন তা ছিঁড়ে গেল, তাও সত্য। দুটোই সত্য ঘটনা এবং এ দুটোকেই জীবনে সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে হবে। শরৎচন্দ্রের চিন্তা ভাবনায় এই বিপ্লবী ভাবধারার প্রকাশ আরও রয়েছে।

শরৎচন্দ্র কেবল বিজ্ঞানমনস্ক নয়, ছিলেন বহুমুখী জ্ঞানেরও অধিকারী

শরৎচন্দ্রের মানসিকতা ছিল যুক্তি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক। শরৎচন্দ্রকে নানাসময়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনি তো সাহিত্যিক, কিন্তু আপনার ঘরে গিয়ে দেখি যত বিজ্ঞানের বই, অঙ্কশাস্ত্র থেকে শুরু করে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি পর্যন্ত সমস্ত সাজানো রয়েছে। রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান এবং অর্থনীতি শাস্ত্রের বইতেও লাইব্রেরি ঠাসা। কই, বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যিকদের বই তো আপনার ঘরে দেখি না?" একবার চন্দননগরের আলোচনাসভায় মতিবাবুরাও এই ধরনের প্রশ্ন শরৎচন্দ্রকে করেছিলেন। সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এক জায়গায় শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "আমি নিজে গল্প লিখি। গল্প পড়ি না তা নয় — তাই খুঁজে-টুঁজে বের করলে দু'চারখানা হয়তো পাওয়াও যাবে। কিন্তু আমার এসব গল্প পড়তে তেমন ভাল লাগে না।" কথাটা মতিবাবুদের তিনি ঠাট্টা করেই বলেছিলেন। কিন্তু

এই কথাটার দ্বারা আসলে তিনি যে কথাটা বলতে চাইলেন, তা হল, সামাজিক সমস্যা উপলব্ধি করা এবং গল্প বলার মধ্য দিয়ে সে সমস্যা সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয়, অর্থাৎ ঘটনা সংঘাত এবং চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যদি সত্য উদঘাটন করতে হয়, তবে তা একজন সাহিত্যিক তো তখনই পারেন, যখন সমাজ ও মানুষকে তিনি সত্য সত্যই বুঝেছেন। আর এ সত্য বুঝতে হলে বিজ্ঞান না জানলে বোঝা যাবে না। তাই মানুষের কোন মানসিকতা কীভাবে কোন খাতে গড়ে উঠেছে তা জানবার জন্য বিজ্ঞানকে জানতে হবে, ইতিহাসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখতে হবে। দেখুন, কী সুন্দরভাবে তিনি তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতাকে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সাথে মতপার্থক্য ব্যক্ত করে তিনি বলছেন, "পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘোরে, ইহা যতবড় কথাই হউক, সাহিত্যের মন্দিরে ইহার প্রয়োজন গৌণ, কিন্তু যে সুবিন্যস্ত, সংযত চিন্তাধারার ফল এই জিনিসটি, সে চিন্তা নহিলে কাব্যের চলে চলুক, উপন্যাসের চলে না"। আর, তিনি এটা করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর লেখায় যুক্তির ধার আছে, তাঁর 'ডায়ালগ'গুলোর মধ্য দিয়ে যুক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু সাহিত্যই নয়, শরৎচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। একসময় 'যমুনা' কাগজকে তিনি বলেছিলেন, দেখো, আমি গল্প লিখতে পারব, উপন্যাস লিখতে পারব, বায়োলজির উপর, ফিজিক্সের উপর, কেমিষ্ট্রির উপর, ইতিহাসের উপর এবং এইরকম সমস্ত বিষয়ের উপর প্রবন্ধও লিখতে পারব, এমনকি দরকার হলে তোমাদের কাগজের জন্য ছবিও এঁকে দেব। আমি ছবি আঁকতেও পারি। দিতে পারব না শুধু একটিই জিনিস, সেটি হচ্ছে কবিতা। এই কবিতা লেখা ছাড়া আর সবই তোমাদের কাগজে দিতে পারব। এইরকম সর্বগুণান্বিত মানুষ ছিলেন তিনি। যারা সত্যিই তাঁর জীবনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন, তারা জানতেন যে সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে আঁকা পর্যন্ত সবই তিনি জানতেন এবং খুব ভালভাবেই জানতেন। তাঁর আঁকা সমস্ত ছবিগুলিই তাঁর যে লাইব্রেরিটি পুড়ে গেছে তার সাথে নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন একাধারে সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের তদানীন্তন পরিধিতে একজন বিরাট জ্ঞানী।

শাশ্বত সাহিত্যের ধারণার বিরোধী

শরৎচন্দ্রের চিন্তায় প্রগতিশীল ভাবনা-ধারণা কতদূর এগিয়ে গিয়েছিল, তাঁর নিজের একটা উক্তির মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখুন কী বিস্ময়কর! তিনি একজন মানবতাবাদী। নিজে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। অথচ, মানবতাবাদের আলোকে প্রগতির পরিবর্তনের ধারাটাকে তিনি এমন করে বুঝেছিলেন যেটা শাশ্বত সাহিত্যের রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা এবং সৌন্দর্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন, সেই মানবতাবাদীদের অনেকে বোঝেননি। তিনি বলছেন, "যে কাল আজও আসেনি,

সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে কি থাকবে না, সে আমার চিন্তার অতীত। আমার বর্তমানের সত্যোপলব্ধি যদি ভবিষ্যতের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হয়ে মিলতে না পারে, পথ তো তাকে ছাড়তেই হবে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায়, সে শুধু এইজন্যই যাবে যে, আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েছে। ক্ষোভ না করে, বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাব যে, আমার দেশে আমার ভাষায় এত বড় সাহিত্যই জন্ম লাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে। সেই তো আমার গৌরব, সেই তো আমার সাধনা।'' অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে, তিনি যে সাহিত্য রচনা করছেন, এটা একটা সাধনা, একটা সংগ্রাম। এই সাধনায় তিনি সক্ষম হয়েছেন বলে তখনই মনে করবেন, যদি তাঁর সাহিত্য এমন জমি তৈরি করে দিয়ে থাকে, যে জমির উপর তার থেকে উন্নততর সাহিত্য হবে, যার তুলনায় তাঁর লেখা একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে। সেখানেই তাঁর যথার্থ সার্থকতা। এখানে তিনি শাশ্বত সাহিত্য সৃষ্টির ধারণার বিরোধিতা করেছেন। এই শাশ্বত সাহিত্য সৃষ্টির ধারণার বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও মতপার্থক্য হয়েছে। তিনি বলেছেন, মানুষের মন পাল্টাচ্ছে, মানুষের রুচি পাল্টাচ্ছে, মানুষ এক জায়গায় থাকছে না। তাই চিরন্তন, শাশ্বত মূল্যবোধের ধারণা অচল। মানুষকে এবং মানুষের সমাজকে নিয়ে যদি সাহিত্য হয়, তাহলে যেখানে মানুষ পাল্টে যাচ্ছে, মানুষের সমাজ এবং মানুষের প্রয়োজন পাল্টে যাচ্ছে, সেখানে তার মাপকাঠিতে সাহিত্যের নীতি, মাত্রা এবং মূল্যবোধগুলিও পাল্টে যাবে। তাই দেখুন, যন্ত্রকে কেন্দ্র করে যে মানুষগুলোর জীবনধারা পাল্টে গেল, তাদের নিয়ে সাহিত্য তিনি খুব বেশি সৃষ্টি করতে না পারলেও তার তাৎপর্যটা তিনি ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, গুরুদেব মেশিন দেখলেই মনে করেন ওটা অসুন্দর। তিনি শুধু মেশিনের ঘড়ঘড়ানিই শুনতে পান। কিন্তু বাস্তবজীবনের প্রয়োজনে, উৎপাদন বিকাশের প্রয়োজনে যে শিল্পসভ্যতা গড়ে উঠেছে তাকে ভিত্তি করে যে শ্রমিকরা এসেছে তাদের জীবনের নতুন প্রয়োজন ও নতুন যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা তিনি দেখতে পান না।। এই শ্রমিক জীবন ঘিরে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আরেকটি অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখুন। তিনি বলছেন, "এই অভিশপ্ত, অশেষ দুঃখের দেশে, নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখ বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে''।

সাহিত্যের মাত্রা নিয়ে সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে কোট করে শরৎচন্দ্র বলছেন, ''কবি বলছেন, উপন্যাস সাহিত্যের সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে। '' অর্থাৎ

রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস সাহিত্যে 'ইন্টেলেকচুয়ালিজম' সমর্থন করেননি। শরৎচন্দ্র এর উত্তরে বলছেন, 'উপন্যাস সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।'' শরৎচন্দ্রের আরও বক্তব্য ছিল, সাহিত্যের মাত্রা শাশ্বত নয়, চিরন্তন নয়। মানুষের মন পাল্টায়। তিনি বলছেন, আগে যেসব বিষয়বস্তুতে পাঠক-পাঠিকার মন ভরত, আজ তাতে মন ভরে না। আজকের সমস্যা আলাদা। তাকে আজকের সাহিত্য প্রতিফলিত করবে। এই তাঁর উপলব্ধি ছিল। তাই সেই উপলব্ধিতে তিনি ধরছেন, আবার ভবিষ্যতে আর একটা দিন আসছে, যখন আজকের যে সমস্যাবলি, যা নিয়ে আমরা গল্প-উপন্যাস লিখি, নরনারীর মন দেওয়া-নেওয়া বা মান-অভিমানকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা নিয়ে আজ আমরা লিখি, সেটা দিয়ে আগামী দিনে মানুষের মন ভরতে চাইবে না। মানুষ আরও জানতে চাইবে। অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে জানতে চাইবে, রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে জানতে চাইবে, জানতে চাইবে জীবনের সম্বন্ধে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে। এই যে নতুন সমস্যাভিত্তিক উপন্যাস কী হবে, তার 'মডেল' তুলে ধরার জন্য তিনি 'শেষ প্রশ্ন' সৃষ্টি করেন। দেখুন, 'শেষ প্রশ্ন'-তে দর্শন এবং কঠিন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক শুধু। অথচ, ঠিক চরিত্র উপস্থাপনা, তার সংযোজনা এবং তারই মধ্যে ডায়ালগ-এর মাধ্যমে শুধু তত্ত্বের ওপর এতবড় একটা আলোচনা হয়ে গেল, বই হয়ে গেল। একদল সমালোচক আছেন, যাঁরা বলছেন যে, ওটা উপন্যাসই নয়। আমি এইধরনের ব্যক্তিদের সাথে কোনও বিতর্কে যেতেই রাজি নই। আমি মনে করি, তাঁরা এসব আলোচনার যোগ্যই নন। উপন্যাস সম্পর্কে তাঁদের একটা 'স্টিরিওটাইপ' ধারণা আছে এবং সেটা নিয়েই তাঁরা চলেন। তাঁদের সব নোট বই লেখা সাজে, কিন্তু, এসব বিষয়ের সমালোচক হতে গেলে যে জিনিসের দরকার, সেটা তাঁদের নেই।

এখানে একটা কথা আপনাদের বলব। আপনারা যাঁরা সমাজ নতুন করে গড়বেন, যাঁরা গণআন্দোলনে আসবেন, মানুষের সমস্যা নিয়ে ভাববেন এবং লড়বেন তো বটেই, এমনকি ভবিষ্যতেও যাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জন্য, অসৎ-এর বিরুদ্ধে সৎ-এর জন্য, কুৎসিতের বিরুদ্ধে সুন্দরের জন্য লড়াই করতে এগিয়ে আসবেন, যুগে যুগে তাদের শরৎচন্দ্রের একটা কথা নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে। শুধু পরিবেশ অনুযায়ী তার মূল্য এবং চরিত্র পাল্টাবে। তা হচ্ছে, ''মন্দ তো ভালর শত্রু নয়, ভালর শত্রু তার চেয়ে যে আরও ভাল, সে'' অর্থাৎ ভালর সত্যিকারের সমস্যা হচ্ছে যার জন্য তাকে আরও লড়তে হয়, তা হচ্ছে আরও ভাল হওয়া। তিনি বলছেন, সমস্ত জিনিসেরই যুগে যুগে রূপ পাল্টায়। ফলে, যেমন করে তারা আসে তেমন করে তাদের বুঝতে হয়। কোনও একটা ধারণাকেই চিরকাল আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। এই কথাটাই 'শেষ প্রশ্নে'

কমল এক জায়গায় বলছে, “যে দুঃখকে ভয় করছেন ... তারই ভিতর দিয়ে আবার তার চেয়েও বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে, আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, সেই মৃতদেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমন করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই ত মানুষের মুক্তির পথ”।

জাতপাত-সংস্কারের মূলে আঘাত করেছেন

ভারতীয় সমাজের জাতপাতের সমস্যা সামাজিক মুক্তির পথে একটি অন্যতম প্রধান অন্তরায়। মানবতার অসম্মানের এই বেদনাকে তুলে ধরা সে কারণে সাহিত্যের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই দেখুন, শরৎচন্দ্রের বাস্তবানুগ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিরাটভাবে একটা বিরোধ এসে গেল। কুসংস্কার, জাতপাত এগুলোকে যেকোনও যুক্তিবাদী মানুষই খারাপ জিনিস বলবেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগেও কোনও বড় মানুষই জাতপাত সমর্থন করতেন না। কিন্তু শরৎচন্দ্র এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পদ্ধতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবং অন্য অনেকের সঙ্গেই একমত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ ছোঁয়াছুঁয়ি জাতপাতের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে এক জায়গায় যুক্তি করছেন যে, ব্রাহ্মণ বিধবার কোলে বসে একটা বিড়াল তার পাত থেকে খেলে তার জাত যায় না, কিন্তু একজন মানুষ ছুঁয়ে দিলেই তার জাত চলে যায়। অর্থাৎ, বিড়াল কোলে বসে খেলে জাত যায় না, আর একটা মানুষ অন্ন ছুঁয়ে দিলে, থালাবাসন ছুঁয়ে দিলে, রান্নাঘরে ঢুকলে জাত চলে যায়। তাহলে মানুষ কি বিড়ালের থেকেও নিচু? এই কথার দ্বারা তিনি দেশের মানুষকে বোঝাচ্ছেন যে, জাতপাত কত খারাপ এবং এই জাতপাত মানার মধ্য দিয়ে মানুষকে তারা কত অপমান করছে। শরৎচন্দ্র এই সম্পর্কে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের এসব কথা খুব বড় কথা, কিন্তু অকার্যকরী। তা আমাদের সমাজে কাজ করবে না এবং তার গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত দিতে পারবে না। শুধু একদল লোক এসব শুনে তারিফ করবে, আর বক্তৃতা করবে মাত্র। এটা মানুষের সমস্যা। এর সমাধানের জন্য গুরুদেবের আলোচনায় কেন যে এসব পশুপক্ষী এসে হাজির হয়, আর এসেই বা তারা কী প্রমাণ করে, আমি বুঝতে পারি না। কথাগুলি শুনতে খুব ভাল, দেখতেও চকচক করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে তা অকিঞ্চিৎকর। বিনয়ের থেকে তিনি বলছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরু এবং তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু, জাতপাতের সমস্যাটাকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে দেখছেন, সেটা এত সহজ নয়। তাই তিনি ঠাট্টা করে বলছেন, গুরুদেবের যুক্তি অনুযায়ী একথা তো কাউকে বলা চলবে না যে, বিড়াল নিকৃষ্ট জীব হয়েও যেখানে ব্রাহ্মণ বিধবার কোলে বসতে পেরেছে,

সেখানে মানুষ যেহেতু শ্রেষ্ঠ জীব, অতএব মানুষেরও তার কোলে এসে বসার অধিকার আছে। একথা বললে কেউ শুনবে? কোনও কাজ হবে? তাহলে এ যুক্তির মানে কী? এ কথার মানে কি এই যে, বিড়ালের চেয়ে যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব — এটা শরৎচন্দ্র জানতেন না? শরৎচন্দ্রও জানতেন বিড়ালের থেকে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব এবং বিড়ালকে অবমাননা না করে মানুষকে অবমাননা করা একটা ভয়ানক অন্যায় কাজ। কিন্তু, সমস্যাটা ধরেছেন তিনি অন্য জায়গায়। শরৎচন্দ্র জানতেন, ছোঁয়াছুঁয়ির দোষ বাঁচিয়ে চলা, জাতপাত মেনে চলা — এই যে জিনিসগুলি মানুষের মধ্যে আছে, এগুলো গভীর সংস্কার। আর কোনও একটা জিনিস অভ্যাস করতে করতে যখন সমষ্টির অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় — অর্থাৎ ঠিক হোক, বেঠিক হোক, মানুষ তাকে মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে — তখনই তা সংস্কারে পরিণত হয়। তিনি বলেছেন, এর দ্বারা সমাজ থেকে এই কুসংস্কার দূর করার ক্ষেত্রে আসল সমস্যাটা যে জায়গায়, সেই জায়গায় ঢোকা হয়নি। তা যদি না ঢোকা যায় — অর্থাৎ, এ কেমন ধরনের সংস্কার এবং এই সংস্কার কীভাবে আমাদের সমস্ত গুণাবলি, আমাদের মহত্ত্ব, আমাদের দায়িত্ববোধ, আমাদের কর্তব্যবোধ, এমনকি আমাদের মনুষ্যত্ববোধকে পর্যন্ত কুরে কুরে খেয়ে দিয়ে যাচ্ছে, তা যদি না দেখানো যায়, তাহলে সমাজ থেকে এই সমস্যা দূর করা যাবে না। তাই সাহিত্যের বিভিন্ন ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে তিনি এটা দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন, এরা জানেন না, একজন বিলেত ফেরত সন্তানের মা, যে সন্তান মাকে না দেখলে বাঁচতে পারে না, মাকে যথার্থ মাতৃত্বের মর্যাদা দেয় এবং মা-ও সেটা অনুভব করেন, মা-ও সেই ছেলের জন্য কাঁদেন, সেই মা ছেলে অসুস্থ হলে তার শুশ্রূষায় শিয়রে বসে না খেয়ে মরবেন, কিন্তু বুক ফেটে গেলেও সেই সন্তানের হাতে তিনি খেতে পারেন না। একে কি অশ্রদ্ধা করা বলে? এর দ্বারা কি মানুষকে বিড়ালের থেকেও নিম্নস্তরের মনে করা বোঝায়? অথচ, সংস্কার মানুষের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়ে এমনভাবে কাজ করছে যে, মানুষ তা না মনে করেও এই জাতপাতের বিচারের বাইরে আসতে পারছে না। শরৎচন্দ্র বলছেন, তাহলে এই সমস্যা কি দুটো বক্তৃতা দিয়ে বোঝানো যায়? এর ওপর দু'পাঁচটা বক্তৃতা দিয়ে লোক ঠকানো যেতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অধ্যাপককে বক্তৃতা দিয়ে ঠকাতে পারে, কিন্তু এর দ্বারা জাতির জীবনে কাজ করা যায় না, সমস্যার গোড়ায় কাজ করা যায় না। তাই শরৎচন্দ্র এই সমাজ বিপ্লবটি সংঘটিত করার জন্য সাহিত্যে নানাভাবে চরিত্রচিত্রণ করলেন। 'গৃহদাহ'-এ রামবাবুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে এবং বহু জায়গায় বহু চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, হিন্দু সমাজে এই জাতপাতের সমস্যাটা সবসময় মোটা অর্থে নীচতার সঙ্গে জড়িয়ে নেই। তা করুণা, মহৎ গুণ, মমতা, ভালবাসার সঙ্গেও জড়িয়ে থাকে। এ এমন একটা সংস্কার যে, মানুষ নিজের পুত্র যাকে ভালবাসে,

তার হাত থেকেও খেতে পারে না। যেখানে এতটুকু অশ্রদ্ধা নেই, ঘৃণা নেই, যেখানে হৃদয়ভরা ভালবাসা আছে — সেখানেও সংস্কারের জন্য মানুষ খেতে পারে না। তাই 'গৃহদাহ'তে মৃণালের মুখ দিয়ে অচলাকে বলছেন, "তোমার হাতে খেতে পারি না, তাই বলে কি সেজদি তোমাকে আমি ঘৃণা করি? এ বললে আমি সবচেয়ে বেশি দুঃখ পাই।" কাজেই এটা ঘৃণার বিষয় নয়। তিনি এই সমস্যাকে সমাজ থেকে দূর করার জন্য সমস্যার মর্মবস্তুতে ঢুকতে বলেছেন।

আবার দেখুন, রামবাবুর মতো এমন স্নেহপ্রবণ এবং সহৃদয় মানুষ যিনি অচলাকে এত স্নেহ করতেন, যে স্নেহ তাঁকে ধর্মের সীমা প্রায় ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল, এক মুহূর্তে সংস্কার এসে যে মানুষটার এতবড় হৃদয়াবেগ, তাকে একটা অমানুষ করে তুলল। তিনি অচলাকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ফেলে প্রায়শ্চিত্তের জন্য কাশী চলে গেলেন। এটা দেখে মহিম ভাবছে, "যে ধর্ম অত্যাচারের আঘাত থেকে নিজেকে এবং অপরকে রক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ তাহাকে মৃত্যু হইতে বাঁচাইতে সমস্ত শক্তি অহরহ উদ্যত রাখিতে হয়, সে কিসের ধর্ম? মানবজীবনে তার প্রয়োজনীয়তা কোনখানে? যে ধর্ম স্নেহের মর্যাদা রাখিতে দিল না, নিঃসহায় নারীকেও মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া পলাইতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করিল না, আঘাত পাইয়া যে ধর্ম এতবড় স্নেহশীল বৃদ্ধকেও এমন চঞ্চল প্রতিহিংসায় এরূপ নিষ্ঠুর করিয়া দিল, সে কিসের ধর্ম"। এইভাবে মানুষের মনের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলোকে ঘা দিয়ে তার মধ্যে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে তিনি ধর্মকে এবং সংস্কারকে আঘাত করেছেন। এগুলোর ওপর মোটা মোটা ভাসা ভাসা তত্ত্ব আলোচনা করেননি। শরৎচন্দ্র সমস্যাগুলোকে এইভাবে দেখেছেন এবং এইভাবে সেগুলোর বিরুদ্ধে সমাজ মানসিকতা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

নারীত্ব, সতীত্ব ও হিন্দুসমাজ

সেই সময়েই শরৎচন্দ্র এক সাহিত্যসভায় সতীত্ব সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে এক দুঃসাহসিক মন্তব্য করে বলেছিলেন, "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড়, এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম। কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোংরা করে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজের আর সীমা রইল না। মানুষ হঠাৎ খেপে গেল। অত্যন্ত সতী নারীকে আমি চুরি, জুয়াচুরি, জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখেছি, এবং ঠিক এর উল্টোটা দেখাও আমার ভাগ্যে ঘটেছে ... সতীত্বের ধারণাও চিরদিন এক নয়। পূর্বেও ছিল না পরেও একদিন হয়তো থাকবে না। একনিষ্ঠ প্রেম ও সতীত্ব যে ঠিক একই বস্তু নয়, একথা সাহিত্যের মধ্যেও যদি স্থান না পায়, ত এ সত্য বেঁচে থাকবে কোথায়"? এই প্রসঙ্গে চন্দননগরের সাহিত্যসভায় মতিবাবুরাও শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন, আপনি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে এত কথা বলেন, হিন্দুধর্মের সতীত্বের ধারণা

নিয়ে এত বিদ্রূপ করেন, কিন্তু আপনি নারীত্বকেই যে শুধু তুলে ধরেছেন, তা নয়, হিন্দুধর্মের প্রতি এবং হিন্দু সতীত্বের ধারণার প্রতিও আপনার একটা মোহ, একটা দুর্বলতা আছে। আপনি তাকে আজও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তাই এক বিছানায় শুইয়েও আপনি দিবাকরের কাছে কিরণময়ীর দেহ দেওয়াতে পারেননি। আজকালকার সমালোচকরা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে যা বলছেন, তা শুনেও তাই মনে হয়। তাঁরা মনে করেন, এক বিছানায় ছেলেমেয়েরা শুলেই দেহ দিতে হয়। এর বেশি কিছু তাঁরা জানে না। নারীত্বের অনেক বড় কথার মধ্যেও ছেলেমেয়ে এক বিছানায় শুলে তার একটা মানেই তারা জানেন, তা হচ্ছে, দেহ আসবেই। অথচ, মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস থেকে তো আমরা জানি, মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নয়। আর, সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের যত বাড়বে, তত প্রকৃতি আমাদের বশীভূত হবে। অথচ, এদের মধ্যে আধুনিকতার প্রভাব যত বাড়ছে, দেখা যাচ্ছে, এদের প্রবৃত্তির ঝোঁক তত বাড়ছে এবং বিশ্বাসও তত বাড়ছে যে, দেহই নিয়ামক — মন এবং সংস্কৃতি নিয়ামক নয়। যাই হোক এটা অন্য আলোচনা।

মতিবাবুদের প্রশ্নের উত্তর করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বলছেন যে, আপনারা আমার ওই কিরণময়ী চরিত্রের উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারেননি। আপনারা যা বলছেন ওভাবে আমি কিছুই করিনি। অমন লেখাপড়া জানা সুশিক্ষিতা নারী যে কেবল একটা জিদের বশে দিবাকরের মতো একটা বালককে নিয়ে পালিয়ে এল — যাকে সে কোনওদিক দিয়েই সমকক্ষ মনে করে না, তার সাথে যদি দৈহিক সম্পর্ক হতে দিত, তাহলে ওইরকম একটা চরিত্র নষ্ট হয়ে যেত।

শরৎচন্দ্র এই কিরণময়ী চরিত্রটি এঁকে পাঠকসমাজের কাছে ফেলে দিয়ে যেন বলছেন, দেখো তো শিক্ষিত যুবকরা, মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা, যারা প্রগতির কথা ভাব, যারা নথওয়ালা বউ বিয়ে করেছ, বাবা জোর করে বিয়ে দিয়েছে — তাদের কিরণময়ীকে কেমন লাগে? যদি কিরণময়ীর মতো তোমাদের ভালবাসার পাত্রী, তোমাদের স্ত্রী হত, তাহলে কেমন হত? মেয়েদের এমন করে ভাবতে তোমাদের কেমন লাগে? শরৎচন্দ্র কিরণময়ী চরিত্রটিকে নিখুঁতভাবে গড়ে তুলেছেন। 'চরিত্রহীন' বইয়ে সরোজিনীকে দেখা গিয়েছে শিক্ষিত পরিবেশে শিক্ষিত মেয়ে। সুরবালাকেও সবাই দেখেছে, উপেনের মতো স্বামীও যার ভালবাসার রসে একেবারে মগ্ন হয়ে আছে। ওই একই বইয়ের ভিতরে সাবিত্রীর চরিত্র কী অপূর্ব রস এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। এই চরিত্রগুলো না থাকলে কিরণময়ীকে আঁকা অতো কঠিন হত না। তার সৌন্দর্যের সীমা নেই, বিদ্যা-বুদ্ধি-পাণ্ডিত্যের সীমা নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তদানীন্তন সময়ের মাপকাঠিতে তার জ্ঞান অসাধারণ, যার সঙ্গে যথেষ্ট জ্ঞানী উপেন্দ্রও তর্কে এঁটে উঠতে পারে না। সে বেদ-বেদান্তে এবং সমস্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইংরেজি সাহিত্যের ওপরেও তার দখল আছে। একজন গৃহবধূর চরিত্রকে

এইভাবে তিনি এঁকেছেন, ঔদার্য এবং গুণাবলিও তার কোনওদিক থেকেই কম নয়। কিন্তু সে বিধবা, তার স্বামী মরে গেল। যে উপেন্দ্রকে সে ভালবাসল, সেই উপেন্দ্রর পক্ষে তাকে ভালবাসা অসম্ভব। কারণ, উপেন্দ্রর কাছে ভালবাসা একটা ধর্ম। সে এই সমাজের মহৎ, ধর্মনিষ্ঠ এক ধরনের ছেলে। সে তার স্ত্রীকে ভালবাসে। এর বাইরে সে যেতে চায় না। অথচ, কিরণময়ী তাকেই ভালবেসে বসল এবং ভালবাসল এটা জেনেই যে উপেন্দ্রর পক্ষে এ গ্রহণ করা সম্ভব নয়, এ কোনও দিনই সফল হবে না। কারণ তার আশেপাশে যাদের সে দেখেছে তাদের মধ্যে উপেন্দ্র ছাড়া তার জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধি অনুযায়ী আর কাউকে সে ভালবাসতে পারে না। সতীশ ছেলেমানুষ, তাকে ভাইয়ের মতো ভালবাসা যায়, কিন্তু কিরণময়ীর মতো মেয়ে তাকে ভালবাসার বা প্রেমের পাত্র ভাবতে পারে না। যেমন করে আজকাল একদল স্কুল-কলেজের শিক্ষিতা মেয়েরা রাস্তার রকবাজ ছেলেদের প্রেমের পাত্র বলে ভাবে, কিরণময়ী সেরকম শিক্ষিত মেয়ে নয় — সেরকম রুচি দিয়ে তাকে গড়ে তোলা হয়নি। যে রুচির মান দিয়ে তাকে গড়ে তোলা হয়েছে, তাতে যে চরিত্র তদানীন্তন পরিবেশে তাকে আকর্ষণ করেছে, সে হচ্ছে উপেন্দ্র। উপেন্দ্রও খানিকটা হিউম্যানিস্ট চরিত্রের। ফলে, সে এই জিনিসটা দেখে ভাবল, এ ভালই হল। তার ভালবাসা আমাতে বর্তেছে, এতে ক্ষতি হবে না। কারণ, আমি একটা লোক যে কখনও মচকাব না বা ভাঙব না। আমার দ্বারা কারও অনিষ্ট হতে পারে না। ফলে কিরণময়ীর পক্ষে এ একটা মঙ্গলই হল।

কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন। ভালবাসা যখন তার মধ্যে আসে তখন তার হাজার একটা রূপ। হাজার একটা দিকে সে খেলতে চায়। তার পরিতৃপ্তির একটা ব্যক্তিগত নিজস্ব দিক আছে। কারণ, এই চরিত্রগুলোর কোনওটাই কমিউনিস্ট চরিত্র নয়, ‘সেল্ফলেস ডেডিকেশন’ এর চরিত্র নয়। এগুলো সবই হিউম্যানিজম-এর আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তিগত মানসিকতার চরিত্র। ফলে, জীবনে প্রয়োজনের বহু ব্যক্তিগত দিক তাদের সামনে রয়েছে। রয়েছে বলেই কিরণময়ীর জীবনেরও স্নেহপ্রীতির প্রকাশের বিভিন্ন দিক এটাকে কেন্দ্র করে উন্মুক্ত হতে শুরু করল। একদিন যে ভালবাসার স্বাদই সে পায়নি, উপেন্দ্রকে পেয়ে, সতীশকে ভাইয়ের মতো পেয়ে তার সেই ভালবাসার দ্বার খুলে গেল। যেহেতু সে অত্যন্ত রুচিবান, তাই আর্ট, হিউমার এর পথে তার ভালবাসা দিবাকরকে নিয়ে সন্তানের মতো, দেবরের মতো খেলতে শুরু করল। কিন্তু প্রচলিত সমাজের শাসন, তার মানসিকতা এবং পরিবেশ এমনকি ঘটনাচক্রে উপেন্দ্র তাকে অন্যায়ভাবে আঘাত করল। আর সে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন নারী বলেই উপেন্দ্রর এই অন্যায় আঘাত তার মধ্যে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল এবং মুহূর্তের বিচারে এই অন্যায় সম্পর্কে একটা আপেক্ষিক যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি সে নিতে পারল না, যেটাকে একটা মুহূর্তের বিচার বা ‘সাইকোলজিক্যাল

রিঅ্যাকশন' বলা যেতে পারে। শাশুড়ির মিথ্যা অভিযোগ শুনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে উপেন্দ্র যখন অন্যায়ভাবে তার চরিত্রকে আঘাত করল, তখন ক্ষিপ্ত ও জ্ঞানশূন্য হয়ে সেও পাল্টা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দিবাকরকে নিয়ে বার্মায় চলে গেল। দিবাকরকে সে নিয়ে এল শুধু উপেন্দ্রকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। কারণ সে জানত দিবাকর উপেন্দ্রর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। কাজেই সে ভাবল, দিবাকরকে নিয়ে গিয়ে উপেন্দ্রকে সে একটা আঘাত দেবে। কিন্তু, শেষপর্যন্ত সে দেখল, এর দ্বারা উপেন্দ্র যত না আঘাত পেয়েছে, সে-ই আঘাত পেয়েছে বেশি। সে এতবড় আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বলে বহুদিন পর্যন্ত সে নিজের সঙ্গেই লড়াই করে গেছে, কিন্তু নিজেকে নষ্ট হতে দেয়নি। এমন একটি ব্যক্তিত্বশালিনী, গুণবতী, চরিত্রবতী যে নারী, সে কখনও দিবাকরের মতো একটা খোকার কাছে দেহদান করতে পারে না। তাই উপেন্দ্রর প্রতি প্রতিশোধস্পৃহা থেকে দিবাকরের মধ্যে যে কামনার আগুনটি সে জ্বালিয়েছিল, তার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য আপ্রাণ লড়াই করে করে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, কিন্তু তবু আত্মসমর্পণ করেনি এবং এটা একমাত্র কিরণময়ীর মতো নারী চরিত্রই পারে। শরৎচন্দ্র ওইরকমভাবেই তাকে সৃষ্টি করেছেন বলেই তাকে পথেও নামাতে পারেননি, আবার ঘরেও ফেরাতে পারেননি। তাকে উন্মাদ করা হয়েছে। যার ভিতরে এমন বিদ্যাবুদ্ধির তীক্ষ্ণ দিক আছে, সাময়িক একটা আঘাত মুহূর্তের জন্য তার বিচারকে গোলমাল করে দিলেও তাকে শেষপর্যন্ত আচ্ছন্ন রাখতে পারে না। এই আশাতেই উপেন্দ্র যাওয়ার সময় বলছে, এতবড় বুদ্ধিদীপ্ত নারী কখনও এভাবে আচ্ছন্ন থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই সে নিজেকে আবার ফিরে পাবে।

অন্ধ বিশ্বাসের শক্তি

আবার এই চরিত্রহীন উপন্যাসেই তিনি উপেনের স্ত্রী সুরবালাকে এঁকেছেন একটি অত্যন্ত সরল ধর্মপ্রাণ মহিলা হিসাবে, বিশ্বাসই হচ্ছে যার একমাত্র মূলধন। সে পুরাণে বর্ণিত সমস্ত কাহিনী, সমস্ত ধর্মীয় নীতিকে চরম বিশ্বাসে সত্য বলে আঁকড়ে ধরে বসে আছে, সেগুলো ভাল কি মন্দ — তা তার কাছে বিচার্য বিষয়ই নয়। এই সুরবালার মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র একটা জিনিস দেখাতে চেয়েছেন যে, যখন মানুষ অবিচলভাবে চরম বিশ্বাসে কোনও জিনিস এইভাবে ধরে থাকে, সেটা সত্যই হোক, আর মিথ্যাই হোক, তার মধ্য দিয়ে একটা সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, দেখ সুরবালা কত মিথ্যা, বাজে, অর্থহীন জিনিস ধরে বসে আছে, কিন্তু তার ধরার পদ্ধতিতে এমন অবিচলিত বিশ্বাস রয়েছে বলেই তারই মধ্যে কেমন সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। অথচ যেগুলো সে ধরে বসে আছে, সেগুলি বাজে ছেলেমানুষি জিনিস। তাহলে কোনও বড় জিনিসই খালি বললে হয় না, তাকে এইরকম দৃঢ়ভাবে ধরতে হয়। এই একটা জিনিস সুরবালার চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে

তিনি দেখাচ্ছেন।

সুরবালার এই চরম বিশ্বাস ও একান্ত ভক্তিভাবটির জন্যই দেখুন তার প্রতি কিরণময়ীর কী প্রশংসা! সুরবালা বিশ্বাস করে রামায়ণ মহাভারতের প্রতিটি ঘটনাই সত্য, না হলে বইয়ের আকারে সেগুলি লেখা আছে কেন? লেখা যখন ওখানে আছে, তখন তার কাছে তা সত্য। কারণ, তার ধারণা ওই বই দু'খানা ঈশ্বর তৈরি করে রেখে গেছেন, মুনি-ঋষিরা তৈরি করে গেছেন। ফলে, এর একটি অক্ষর কোথাও প্রক্ষিপ্ত নয়, বিক্ষিপ্ত নয়, রূপক নয়। এর প্রতিটি কথা তার কাছে জ্বলন্ত সত্য। অর্থাৎ বেদ যারা মানে তারা বেদের অক্ষরকে যেমন সত্য মনে করে, সুরবালাও রামায়ণ-মহাভারতের প্রতিটি অক্ষরকে তেমন সত্য বলে মনে করে। সে কতবড় পাগল এবং মূর্খ তা দেখাবার জন্যই কিরণময়ীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর সকলেই মনে করেছে কিরণময়ী তাকে হারিয়ে দেবে। কোনও যুক্তি দিয়ে তার সাথে তারা পেরে ওঠে না। আর সুরবালার যুক্তিগুলো কী অদ্ভুত ধরনের তা আপনারা শুনলেই বুঝতে পারবেন। সুরবালাকে দেখবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল কিরণময়ীর মধ্যেও ছিল। কারণ সে দেখতে চেয়েছিল, সুরবালা কী এমন নারী যেখানে সে হেরে গেল, সুরবালা উপেন্দ্রকে এমনভাবে ছেয়ে আছে যার রসে উপেন্দ্রর মন একেবারে টগবগ করছে। সেখানে গিয়ে সে দেখছে, উপেন্দ্র সুরবালার বোকামি নিয়ে রস করছে। কিন্তু উপেন্দ্র যে রস করছে, তাতে কিরণময়ীর মনে ঈর্ষার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ সে দেখছে, উপেন্দ্র বলছে বোকামি, কিন্তু তার মধ্য দিয়ে যেন মধু উপচে পড়ছে। সেই বোকামিটাকেই যেন সে চেখে চেখে উপভোগ করছে। ফলে কিরণময়ীর ঈর্ষা হচ্ছে। কিরণময়ী দেখছে, ঘরভর্তি সকলে মিলে সুরবালাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। তারা বলছে, এ কখনও হতে পারে না যে, অর্জুন একটা বাণ মারল মাটিতে আর সেই পাতাল থেকে জল এসে ভীষ্মের মুখে পড়ল। এটা প্রক্ষিপ্ত, এ কখনও হতে পারে না। সুরবালা শুনে ভয়ানক চটে গেছে। বলছে, এ যদি না হবে তাহলে বইয়ে লেখা আছে কেন? অর্থাৎ তার যুক্তি হচ্ছে বাণ যদি অর্জুন না মারবে এবং জল যদি পাতাল থেকে না আসবে তাহলে ভীষ্মের তৃষ্ণারনিবৃত্তি হল কী করে? ভীষ্মের যে একমাত্র গঙ্গাজলেই তৃষ্ণা নিবৃত্ত হবে আর সেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি যে তার হয়েছিল এ কথা তো সত্য। তাহলে অর্জুন বাণ মেরেছিলেন নিশ্চয়ই, গঙ্গাও এসেছিল এবং তার তৃষ্ণাও নিবৃত্ত হয়েছিল। আর একথা মহাভারতে যখন লেখা আছে, তখন তা সত্য। এই হচ্ছে সুরবালার দৃঢ় বিশ্বাস। সকলে তো তার কথা শুনে হেসেই লুটিয়ে পড়ছে।

কিন্তু কিরণময়ী দূর থেকে সুরবালাকে লক্ষ করে দেখছে। দেখছে তার চোখেমুখে যেন একটা জীবন্ত বিশ্বাস জ্বলছে। দেখুন, কিরণময়ী তর্কশাস্ত্র মানে। উপেন্দ্রর থেকেও তার পাণ্ডিত্য বেশি, এমনভাবে কিরণময়ীর চরিত্র তৈরি করা

হয়েছে। কারণ, যে হারাণদার হাতে কিরণময়ী গড়ে উঠেছে, সেই হারাণদার কাছে উপেন্দ্র নিজেকে শিশু মনে করে। হারাণদা ছিলেন এথিস্ট, অ্যাগনস্টিক। তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞানবিদ্যাবুদ্ধি, দর্শনের যা কিছু তাঁর জ্ঞান সব একেবারে যত্ন করে ছাত্রীর মতো কিরণময়ীকে শিখিয়েছিলেন। কাজেই জ্ঞানবিজ্ঞানে, দর্শনশাস্ত্রে, থিওলজিতে কিরণময়ী সুপণ্ডিত। সে বসে বসে তাদের তর্ক শুনছে আর সুরবালাকে লক্ষ করছে। সব দেখেশুনে তার চোখ ছলছল করে উঠছে। সকলে মিলে যখন সুরবালাকে ঠাট্টা করছে, সে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছে। কারণ, এইখানে সে বুঝতে পেরেছে, সুরবালার কোন জিনিসটা উপেন্দ্রকে জয় করেছে। সে বুঝতে পেরেছে উপেন্দ্রকে জয় করেছে সুরবালার রূপও নয়, জ্ঞানবিদ্যাবুদ্ধিও নয়, জয় করেছে তার এই ছেলেমানুষি সরলতা, তার এই একান্ত বিশ্বাস। যা সে বিশ্বাস করে, তা অন্তর থেকে বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস করে স্বামীই সব, তাকে সে বিশ্বাস করে। ন্যায়নীতির যেগুলো ভালমন্দ সেগুলো সে বিশ্বাস করে। ধর্ম তার কাছে জ্বলন্ত বিশ্বাস। এগুলো তার কাছে একেবারে অপরিত্যাজ্য। তাই কিরণময়ী সুরবালাকে বলছে, দেখ বোন, ওরা ঠাট্টা করছে, ওরা বুঝবে না। ওরা নিজেদের খুব জ্ঞানীগুণী ভেবে হাসছে, কিন্তু ওরা জানে না যে, তুমি আজ যেভাবে প্রমাণ করে দিলে, দর্শনশাস্ত্রের কোনও পণ্ডিতই যারা ঈশ্বর এবং ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেছে তারা এর থেকে বেশি উন্নত ধরনের কিছু প্রমাণ করেনি। অর্থাৎ তারাও এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই 'হাইপোথেটিক্যাল' যুক্তিতে প্রমাণ করেছে। সুরবালাও ঠিক তাই সত্য ধরে নিয়ে প্রমাণ করেছে। শুধু তার বচনভঙ্গিটা পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয়, কথার চাতুর্য তার মধ্যে নেই। এইজন্য সকলে হাসছে, মনে করছে সুরবালা মুর্খ। নাহলে যে পদ্ধতিতে সুরবালা বিচার করেছে, ঠিক সেই পদ্ধতিতেই অর্থাৎ ওই একই বিশ্বাস বা 'থিওরি অফ বিলিফ'- এর ভিত্তিতে সমস্ত হিন্দু দর্শন এবং শাস্ত্রগুলি বিচার করেছে।

বিধবাবিবাহ ও শরৎচন্দ্র

একদল সমালোচক বলে থাকেন শরৎচন্দ্র বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেননি। কারণ, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যে বিধবাদের বিয়ে দেননি। সাবিত্রী বিধবা — তাকে বিয়ে দেননি, রমা বিধবা — তাকেও বিয়ে দেননি। ফলে, একথা তো পরিষ্কার বোঝাই যায় যে, বিধবাদের বিয়ে দিতে তাঁর কুসংস্কারে বেধেছে। তাই শরৎচন্দ্র একটা সময়ে দুঃখ করে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন করতে চাইলেন। আইনের সহায়তা নিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জোর করে কিছু সংখ্যক বিধবার বিয়েও দিলেন, কিন্তু সমাজ থেকে ওই প্রথাকে হটাতে পারলেন না। কারণ, সামাজিক আন্দোলন হিসাবে তা রূপ নিতে পারেনি। যদি পারতো — তবে সার্থক হত। আইন প্রণয়ন হওয়া সত্ত্বেও বৈধব্যপ্রথা সংস্কারের

মধ্যে জট হয়ে থেকেই গেল। তদানীন্তন সময়ে সাহিত্যিকরা যদি মানুষের মনে ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে মানুষের মানসিক গুণকেই পাল্টে দিতে পারতেন, বিধবাদের বিবাহ না দেওয়ার ফলে সমাজ, আদর্শ, নীতি, সৌন্দর্য, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুই কীভাবে মরছে, কীভাবে পুরুষরা নিজেদেরই তার দ্বারা অধঃপতিত করছে, তারা যে শুধু বিধবাদেরই ঠকাচ্ছে না, নিজেরাও ঠকছে এবং তার দ্বারা যে পুরুষরাও হীন হয়ে যাচ্ছে, 'করাপ্ট' হয়ে যাচ্ছে, কূপমণ্ডুক হয়ে যাচ্ছে — এগুলো দেখাতে পারতেন, বিধবাবিবাহের প্রচলনের পক্ষে একটা সামাজিক মতামত তৈরি হতে পারতো। অথচ, এটা না হওয়ার জন্য গোটা সমাজই তাকে গ্রহণ করল না এবং এতবড় একটা মহৎ প্রচেষ্টা শুধু তার জন্যই ব্যর্থ হয়ে গেল। এমনকি দীর্ঘদিনের মজ্জাগত সংস্কারে বিধবারাও মনে করে বিধবা বিবাহ পাপ, অধর্ম। এই কথাই 'গৃহদাহ'তে মৃণাল বলেছে, "যারা বিধবা বিবাহের আইন পাশ করেছে, তারা ভেবেছে এটা হলেই আমরা বিয়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাব। এটা ঠিক নয়"। বলেছে, "স্বামী জিনিসটাই আমাদের কাছে ধর্ম, তাই তিনি নিত্য। জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য। তাঁকে আর আমরা বদলাতে পারিনে।"

বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে যে তিনি সমর্থন করতেন এবং বিধবাবিবাহ হওয়া দরকার বলে তিনি মনে করতেন, তা বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য থেকেই পরিষ্কার। নারীর মর্যাদাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি যে সমস্ত কথা বলেছেন, তাঁর সেই সমস্ত কথার মধ্যেও তার প্রমাণ রয়েছে। অথচ, এইসব তথাকথিত সমালোচকরা তাঁর মধ্যে হিন্দুধর্মের সংস্কার দেখতে পেল, আর কিছু দেখতে পেল না। শরৎচন্দ্র শুধু শিল্পসৃষ্টি করতে চাননি। শিল্পসৃষ্টির পিছনে একটা উদ্দেশ্য তাঁর কাজ করেছে, তা হচ্ছে, শিল্প সমাজবিপ্লব বা সমাজের পরিবর্তন আনবার উপযোগী মানসিকতা এবং আলোড়ন সমাজের মধ্যে গড়ে তুলবে, মানুষের রুচিকে সেইভাবে গড়ে তুলবে। তাই তাঁর সাহিত্যের মূল ভিত্তি ছিল, গোঁড়া হিন্দু সমাজটাকে ভাঙতে হবে। কিন্তু তিনি মনে করতেন, সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে একে ভাঙতে পারা যাবে না। বিপ্লব সংঘটিত করে সমাজটাকে ভাঙতে হলে সমাজের মধ্যে থেকেই তাকে ভাঙতে হবে। তাই ব্রাহ্মদের গুণাবলি সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলেও তিনি ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধতা করেছেন। তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মদের দ্বারাও সমাজপরিবর্তনের বা সংস্কারের কোনও কাজ হয়নি। কারণ, ব্রাহ্মধর্মও হিন্দুধর্মের মতো একটা জরাগ্রস্ত ধর্মে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই ব্রাহ্মরা বেশি কিছু করতে পারেনি, তারাও শেষপর্যন্ত কূপমণ্ডুকতার মধ্যে গিয়ে পড়েছে। এতবড় একটা মহৎ আবেদন নিয়ে যে ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা জমিতে দাঁড়াতে পারল না বলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

তিনি তাঁর সাহিত্যে বিধবা চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে নিচুস্তরের

ভালবাসা নয়, মহত্তর ভালবাসা দেখিয়ে প্রত্যেক পাঠকের মনের মধ্যে এমন প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিয়েছেন, যে আকাঙ্ক্ষায় তারা ছটফট করবে যে, এদের মিলন হলে খুব ভাল হবে। বই পড়ার পর কল্পনায় তারা ভাববে, রমেশ-রমা মিললে এইরকম কথা বলত, এইরকম 'ডায়ালগ' করত।

এইভাবে শরৎচন্দ্র পাঠককে ভাবতে দিচ্ছেন। এইটা তাঁর সাহিত্যকৌশল। আর, এর দ্বারা একটা প্রচণ্ড ব্যথা পরবর্তী সময়ে চিন্তাশীলদের মধ্যে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন — সেটা হচ্ছে, হিন্দুধর্মের পরিবেশের মধ্যে রমা-রমেশের মিলন হতে পারে না। শুধুমাত্র প্রবন্ধ লিখে বা বক্তৃতা দিয়ে প্রয়োজনীয়তা বোঝানো নয়, তিনি বিধবার মধ্যে নারীর সমস্ত সৌন্দর্যের দিকগুলো পরিস্ফূট করে পুরুষের সঙ্গে তার মহত্তর ভালবাসা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন এবং তার ভিত্তিতে পাঠকের মনের মধ্যে ব্যথা জাগাতে চেয়েছেন যে, এই সমাজে রমেশ-রমার প্রেমের সার্থক পরিণতি হতে পারে না। এইসব সমালোচকরা বলছেন, পারে। আমি বলি পারত, যদি তিনি সস্তা সিনেমার মতো, অথবা হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাদের বিয়ে দিতেন। কিন্তু, তাতে শিল্প মরত, ভালবাসাও মরত। সামাজিক কুসংস্কারও পাল্টাত না। শরৎচন্দ্র জানতেন, শুধু নিজেরা ভালবেসে ভালবাসার সৌন্দর্য রক্ষা করা যায় না। যে পরিবেশে আমরা বাস করি, সেই সমাজ যদি সেই ভালবাসাকে শ্রদ্ধার চোখে না দেখে, তাহলে নিজেদের মধ্যে ভালবাসাতেও ঘুণ ধরতে থাকে, তার সৌন্দর্যগুলোও মরতে থাকে। তাই যে ভালবাসার তাঁরা এত প্রশংসা করছেন, সমাজ ছেড়ে হোটেলে গিয়ে উঠলে ভালবাসার সেই চরিত্র থাকবে না। বরং সমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে তার যন্ত্রণা প্রতিমুহূর্তে নিজেদেরই কুরে কুরে খাবে। কাজেই শরৎচন্দ্রকে তৎকালীন হিন্দুসমাজের এই পরিবেশের মধ্যে চিন্তা করতে হয়েছে। একটা গণতান্ত্রিক সমাজ পরিবেশে যে মিলনটা স্বাভাবিক, শরৎচন্দ্রের সময়কার গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজে তা ছিল অস্বাভাবিক। তা যে শুধু অস্বাভাবিক হত তা নয়, সাহিত্যে মেলাতে গেলে দু'দিক থেকে তার আবেদন নষ্ট হত। প্রথমত, এটা হত অবাস্তব। যদিও এইসব সমালোচকরা বলছেন, মিলন না ঘটানোটাই অবাস্তব হয়েছে, আমি বলছি, মিলন ঘটালে সাহিত্যে তাই হত অবাস্তব। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, এর দ্বারা সমস্ত মানুষের মধ্যে যে অভাববোধ, যে বেদনাবোধ, যে ব্যথা তিনি জাগাতে চাইছেন, সেটাই নষ্ট হয়ে যেত। রমা আর রমেশ কেন মিলতে পারল না — এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে সমাজের স্তরে স্তরে এই দুর্দশার মূল কোথায় — তা নিয়ে যে প্রশ্নগুলো দেখা দিয়েছে, তাই নষ্ট হয়ে যেত। এইসব সমালোচকরা বলছেন, রমা আর রমেশ মিলতে পারল না শরৎচন্দ্রের জন্য। কিন্তু, রসগ্রাহী পাঠকসমাজ বইটা পড়েই বলবে, রমা আর রমেশ মিলতে পারল না হিন্দু সমাজের জন্য। কিরণময়ী পাগল হল হিন্দু সমাজের জন্য। সাবিত্রী-সতীশ তাদের

ভালবাসার এতবড় সৌন্দর্য নিয়েও মিলতে পারল না হিন্দু সমাজের জন্য। এই সমস্ত প্রশ্নের তারা এই একটি উত্তরই পাবে।

তাহলে এই সমস্ত চরিত্রগুলো সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকসমাজের কাছে কতগুলো প্রশ্ন তুলে ধরতে চেয়েছেন। তিনি পাঠকসমাজকে বলতে চেয়েছেন, তোমরা কী চাও? পাঠকসমাজ এক বাক্যে বলবে, আমরা এই ধরনের সম্পর্ক চাই, এটা নেই বলেই তো আমাদের পারিবারিক জীবনেও কোনও আনন্দ নেই, আমরা শুধু বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবার চেষ্টা করি। কারণ, শুধু যৌনতার মশলা বেটে আর নিজেকে উত্তেজিত করে মানুষের শিল্পসংস্কৃতি মিশ্রিত যে রসগ্রাহী, শিল্পগ্রাহী মন, তা কতদিন পরিতৃপ্ত হতে পারে? কতটুকু পরিতৃপ্তি পেতে পারে? ভালবাসা ছাড়া, সংস্কৃতি ছাড়া, শিল্প ছাড়া নরনারীর সম্পর্কে সে মাধুর্য গড়ে ওঠে না। মানুষও তাই চায় এবং সেজন্যই চেখে চেখে শরৎসাহিত্য তারা পড়ে এবং তার মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্তি পায়। আর, এইসব সমালোচকরা বলছেন, শরৎসাহিত্যের মধ্যে শুধু হৃদয়বৃত্তির খোরাক মিলছে। এই যে হৃদয়বৃত্তির কথা তাঁরা বলছেন, সেই হৃদয়বৃত্তিটা কী? সেটা কি 'ইনস্টিংক্ট'? না, এ হচ্ছে হৃদয়ের সেই বৃত্তি যে উন্নততর বৃত্তিগুলি অনুধাবন করতে পারলে, আয়ত্ত করতে পারলে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি সূক্ষ্মতর হবে, মানুষ আরও বড় হবে। তারা 'ইনস্টিংক্ট' বলতে যা বোঝেন, এটা তা নয়।

'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, সাবিত্রী সমাজের প্রচলিত মনন, সমাজের যে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মভিত্তিক নৈতিকতা — তার বিচারে একটা কুলটা, একটা বাড়ির দাসী মাত্র। সরোজিনীর মতো একটা শিক্ষিতা ভদ্রঘরের মেয়ের কাছেও যে লোভনীয় পাত্র, সেই সতীশ কী করে এই সাবিত্রীকে ভালবাসতে পারে? সতীশের সঙ্গে তার যদি কোনও সম্পর্ক হয়ও তবে সেটা একটা ক্লীব সম্পর্ক হতে পারে, অথবা একটা নিম্নস্তরের যৌন সম্পর্ক হতে পারে। শরৎচন্দ্র অতি সাধারণ এই ধরনের একটা মেয়েকে নিয়ে এসে সতীশের সঙ্গে রসিয়ে রসিয়ে সংলাপের মাধ্যমে অতি সতর্কতার সঙ্গে, সমস্ত নিম্নবৃত্তি থেকে তাদের রক্ষা করে সম্পর্কটাকে সত্যিকারের আকর্ষণীয় করে তুলে একটা সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন এবং সমস্ত ধর্মান্ধ পাঠকসমাজ, ঘরের বৌ-ঝি এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত লোকের সামনে ফেলে দিয়ে বলতে চাইলেন — দেখ তো এটা খারাপ কি না? এই সম্পর্কটা দেখতে কী রকম লাগছে? পড়তে মনে ব্যথা লাগে? সাবিত্রীর জন্য কি তোমরা দুঃখ অনুভব কর? সতীশ-সাবিত্রী মিলতে না পারলে তোমাদের মনের মধ্যে কি বেদনা এবং ক্ষোভ জাগে? সবাই একবাক্যে উত্তর দেবে, 'হ্যাঁ জাগে। আমরা চাই ওদের যদি মিলন হত'। শরৎচন্দ্র বলতে চাইলেন, তোমরা চাওয়া সত্ত্বেও ওদের মিলন হতে পারে না, যতক্ষণ হিন্দুধর্ম ও হিন্দু

সমাজটি আছে। শরৎচন্দ্র তাঁর এইসব লেখাগুলোর মধ্য দিয়ে পাঠকমনে একটা অভাববোধ ও ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে সমাজ অভ্যন্তরে সমাজবিপ্লবের প্রবল আকাঙক্ষা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, সমাজবিপ্লব সম্পর্কে কতকগুলো উপর উপর ফাঁপা কথা আওড়ে নিজেকে এবং অপরকে ঠকাতে চাননি।

তাঁর তথাকথিত সমালোচকদের মধ্যে যুক্তি কাজ করেছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে সাবিত্রীকে সতীশের সাথে বিয়ে দিতে পারতেন। সতীশের মধ্যেও এই যুক্তির ঝোঁক যে কাজ করছিল না, তা নয়। রোগশয্যা থেকে ওঠার পর উপেন্দ্র যখন সাবিত্রীকে তার সাথে নিয়ে যেতে চাইছে, তখন সতীশ সাবিত্রীকে বলছে, "না, এ আমার বাড়ি, আমার দেশ, আমার জমিদারি, আমি নিয়ে যেতে দেব না। উপীনদা এমন করে চিরকাল আমার সর্বনাশ করেছে"। সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করছে, "আমাকে নিয়ে কী করবে? বিয়ে করবে"? বলেই হেসে ফেলেছে। তারপর বলছে, "অসম্ভব, এ হতে পারে না"। সতীশ বলছে, "কেন হতে পারে না? উপীনদাই বলেছে তুমি কারো থেকে ছোট নও। কাজেই তোমাকে আমি যেতে দেব না"। সাবিত্রী তার উত্তরে বলছে, "দাদা সমাজের অতীত। কাজেই তার পক্ষে যা সত্য, আর তুমি আমি যে দুইজন আজও সমাজে বাস করি, সেই সমাজের মধ্যেই জীবন কাটাতে হলে আমাদের পক্ষে তা সত্য হতে পারে না"। দেখুন, বিচারের কী অদ্ভুত ভঙ্গিমা! সাবিত্রী বলছে, "দাদা ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তুমি তার সৎ উদ্দেশ্য দেখতে পাওনি। তাই মনে করছ, তোমার থেকে আমাকে বুঝি তিনি দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন। আসলে তিনি এর মূল্য বোঝেন বলেই আমাকে আজ আশ্রয় দিচ্ছেন, নাহলে তো আমি ভেসে বেড়াতুম"। দেখুন, উপেন্দ্রও এর মূল্য বোঝে। শরৎচন্দ্র কেন তাদের বিয়ে দিতে পারলেন না তার উত্তর সাবিত্রীই দিচ্ছে। সাবিত্রী বলছে, "শ্রদ্ধা ছাড়া ভালোবাসা দাঁড়াতে পারে না। সমাজ যে স্ত্রীকে তার সম্মানের আসনটি দেয় না, কোনো স্বামীরই তো সাধ্য নেই নিজের জোরে সে আসনটি তার বজায় করে রাখে"। অর্থাৎ ভালবাসাকে মর্যাদা দেওয়ার মতো সামাজিক পরিস্থিতি যতক্ষণ না সৃষ্টি হচ্ছে, ততক্ষণ সাবিত্রীর মতো গৃহত্যাগিনী একজনকে বিয়ে করে সতীশ সুখী হতে পারবে না, সাবিত্রীও সুখী হতে পারবে না। এই সমাজে তাকে রক্ষা করার কোনও উপায় নেই। তাই এই হল ভাল। তাই সাবিত্রী-সতীশের মধ্যে যে সুন্দর জিনিস গড়ে উঠেছে, হিন্দু সমাজের পরিবেশে তার মিলন হতে পারে না বলে পাঠকের মনের মধ্যে সেই টানা অফুরন্ত ব্যথাটাকে তিনি জাগিয়ে রাখছেন। কিরণময়ী, সাবিত্রী এইসব চরিত্রগুলো সৃষ্টি করার দ্বারা শরৎচন্দ্র কী দেখাতে চেয়েছেন? আসলে তিনি সমাজের কাছে প্রশ্ন করতে চেয়েছেন, কোথায় এর সমাধান? পাঠকদের মধ্যে এইসব চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি প্রশ্ন জাগাতে চেয়েছেন,

তোমরা কিরণময়ীর মতো এমন মেয়ে চাও কি? যদি চাও তবে এইসমাজে তাকে লালনপালন করবে কী করে? তোমরা যেসব মেয়েদের নিয়ে ঘর কর তাদের মতো, না সাবিত্রীর মতো ভাষায় তোমাদের সঙ্গে কথা বলে তেমন মেয়ে চাও? যদি তেমন চাও, তাহলে সেই মেয়ে এই সমাজে জন্মগ্রহণ করলেও তাকে তোমরা ধরে রাখবে কী দিয়ে? হয় তোমরা নথওয়ালা বউ নিয়ে ঘর কর, হিন্দুধর্মের আচার-বিচার কর, আর না হয় সমাজটাকে ভাঙো। তাই তখনকার পণ্ডিতসমাজ অর্থাৎ টোলের পণ্ডিতরা যখন তাঁর চরিত্রহীন উপন্যাসখানি নিয়ে গালাগালি করে বললেন যে, এটা অত্যন্ত 'আনএথিক্যাল', কুরুচিকর উপন্যাস, তখন তিনি বলেছিলেন, যাঁরা একথা বলছেন তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে আমি নিজে একজন এথিক্সের ছাত্র আর এই বইখানা মূলত সেই 'এথিক্সে'র ওপরেই একটা বই। কাজেই এর রসবোধ উপলব্ধি করতে হলে মূল সেইখান থেকেই শুরু করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, একটা কথা বলতে বড় দুঃখ হয়। আমি জানি, আজকের মানুষ যদি ঠিক এখনি একে কদর নাও করে, ভবিষ্যতে মানুষ এর মূল্য বুঝবে। অন্তত আমি বুঝেছি মানুষ এর মূল্য বুঝবে।

তাই তিনি বলেছিলেন, বক্তৃতা করে, উপদেশ দিয়ে মানুষের মন থেকে এই সংস্কার দূর করা যাবে না। জাতপাত এবং সামাজিক কুসংস্কারগুলো মানুষের কী সর্বনাশ করছে, তা গল্পের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে ব্যথা জাগিয়ে বুকে টনটন ধরিয়ে উপলব্ধি করাতে হবে। তবে এর গোড়া ধরে নাড়া পড়বে। তাই তিনি 'পল্লীসমাজে' রমা এবং রমেশকে অতি সুন্দর যত্নে এঁকেছেন। যে গ্রাম্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে তিনি তাদের উপস্থাপনা করেছেন, তথাকথিত প্রগতিশীল সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে সেই পরিবেশে রমা-রমেশের বিয়ে দিলে সেটা হত অবাস্তব। তিনি পুরনো গ্রাম্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশে রমা-রমেশকে উপস্থাপিত করে কী করেছেন? তিনি বলতে চেয়েছেন পাঠকসমাজকে, দেখ, দেখ, এমন যে দুটো চরিত্র রমা এবং রমেশ, তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কটাকে কি পছন্দ কর? তোমরা কি এটাকে খুব সুন্দর বলে মনে করছ? রমা ও রমেশকে তিনি এমন করে গড়ে তুলেছেন যে, খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকও মনে করবে, হ্যাঁ, এই সম্পর্ক খুব সুন্দর। কিন্তু তিনি পাঠককে বলছেন, তবু দেখ তাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। কেন ব্যর্থ হয়ে গেল? এর কারণ হিন্দু সমাজ পরিবেশ, যে সমাজ পরিবেশে তারা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এইভাবে সমাজবিপ্লবের মনোভাবনা, প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং তার ভিত্তিতে একটা সামাজিক আন্দোলন সমাজের মধ্যে তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাই দেখা যায়, নিজের কলমকে তিনি সংযত করেছেন। তাঁর আদর্শবাদ একটা জিনিসকে যতদূর পর্যন্ত চিন্তায় পছন্দ করে এবং তেমন করে চরিত্রগুলোকে চিত্রিত করা সম্মত বলে

মনে করে, তা তিনি সব জায়গায় করেননি। কারণ, তা করলে তিনি মনে করতেন, যে সমাজ বিপ্লবের আকাঙ্ক্ষাটা সমাজের মধ্যে তিনি জাগাতে চাইছেন, তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়, সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

সংস্কার নয়, বিপ্লব চেয়েছেন

তাই দেখবেন, মতিবাবু যখন তাঁকে বলছেন যে, হিন্দু সমাজকে একটা সংস্কার করে নিলেই হয় — তিনি বলছেন, না। চন্দননগরের বৈঠকে পরিষ্কার তিনি বলেছেন, সমাজটাকে শুধু সংস্কার করে কিছু হবে না। তিনি বলেছেন, সংস্কার করা আমার কোনও দিনই উদ্দেশ্য ছিল না। যদি সংস্কার করাটাই আমার উদ্দেশ্য হত, তাহলে আমি অন্যভাবে লিখতাম, এভাবে লিখতাম না। আমি দেখাতে চেয়েছি, সংস্কার মানে পুরোনো যন্ত্রের মেরামত, তার দ্বারা আপনারা পুরোনো ঘুণধরা সমাজটাকেই আরও দীর্ঘস্থায়ী করবেন মাত্র। আমি চেয়েছি সমাজটার একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এবং সেটা এই সমাজের মধ্যে থেকেই আমি করতে চেয়েছি। তাই সমাজ ছেড়ে যারা যেতে চেয়েছে, তাদের তিনি পছন্দ করেননি। সমাজের মধ্যে থেকেই সমাজের ক্লেদগুলি তিনি দূর করতে চেয়েছেন ব্যথা জাগিয়ে তুলে, যাতে পাঠকের বুক টনটন করে, রমা-রমেশের জন্য তাদের মন কাঁদে। তিনি পাঠকের মনে প্রশ্ন তুলতে চেয়েছেন, এক লক্ষ বেণীর চেয়েও তোমরা একটা রমেশ এবং রমাকে রক্ষা করতে চাও কি না? যদি চাও তাহলে এই সমাজটাকে ভাঙতে হবে।

সাহিত্যে মনগড়া প্রবলেম সৃষ্টি ও সমাধান শরৎচন্দ্র সমর্থন করতেন না। তাঁর মতে, সাহিত্যে যে প্রবলেম সৃষ্টি করা হয় সেটা কী? সেটা কি কেউ ইচ্ছে করে সৃষ্টি করতে পারে? সমাজের মানসিক জটিলতা থেকে, ঘটনা-সংঘাত থেকে পরিবেশ থেকে যে প্রবলেম গড়ে উঠছে, তাই তো প্রবলেম আকারে সাহিত্যিকের মনে রূপ নেয়। কারোর ইচ্ছা অনুযায়ী তো এই প্রবলেম কেউ চাপিয়ে দিতে পারে না। শরৎচন্দ্র একসময় সাহিত্যে এই সমস্যা সৃষ্টি করে তার জট ছাড়াবার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে 'যোগাযোগ'-এর কুমু'র প্রসঙ্গ তুলে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বই পড়তে পড়তে আমার তো একসময় মনে হয়েছিল যে, এমন কাণ্ড কিছুতেই মীমাংসা হবে না। ক্রমাগত দেখছি জট বেড়ে যাচ্ছে, আর বেড়ে যাচ্ছে, শুধু কতকগুলো কথার আড়ালে এবং অদ্ভুত কতকগুলো জিনিসের আড়ালে। আমি তো ভাবলাম, জট যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে এর শেষ কোথায়? তারপর দেখলাম, একজন লেডি ডাক্তার এল, অমনি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। সেইরকম জলধর সেন সম্পর্কেও বলেছিলেন। জলধর সেনের একটা উপন্যাসে তার নায়ক-নায়িকা এইরকম ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বসে আছে। বোধহয় সেখানে কোনও ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী ছিল। এই

অবস্থায় যেখানে সামাজিক নীতি আছে, আচার আছে, সেখানে তিনি সেগুলোকে বাদ দেবেন কীভাবে? ফলে হঠাৎ দেখা গেল, একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে এসে একজনকে খতম করে দিল। শরৎচন্দ্র ঠাট্টা করে বলেছেন, তা আমি জলধর দাদাকে বললাম, দাদা এটা কী হল? দাদা বললেন, কেন সাপে কি কাউকে কামড়ায় না? শরৎচন্দ্র কিন্তু তাঁর লেখায় এইরকমভাবে কোনও সমস্যার সৃষ্টি বা সমাধান করেননি।

শরৎচন্দ্র ও এথিক্যাল মাদারহুড

আপনারা জানেন, ইতিহাসের একটা বিরাট অন্ধকারময় যুগ গেছে, যেখানে নারীর কোনও স্বাধীনতা ছিল না। তার বিরুদ্ধে মানবতাবাদীরাই প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠে নারী স্বাধীনতার স্লোগান তুলে বলল, নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। শুধু যে এটা নারীর প্রাপ্য তার জন্য নয়, পুরুষেরও বিকাশের দ্বার খুলে দিতে হলে, সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে তাকে গড়ে তুলতে হলে এটা তার প্রয়োজন। নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতার দাবি শুধু যে নারীর দিক থেকে অধিকারসম্মত, ন্যায়সম্মত তাই নয়, পুরুষ যদি নিজেকেও উন্নত করতে চায়, তাহলে নারীকে স্বাধীনতা দিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে। এই শিক্ষা শুধু নারীর অধিকার নয়, এর সাথে যুক্ত এথিক্স, সৌন্দর্যতত্ত্ব, নরনারীর সম্পর্ক। তাতে দেখা গেল, রুচির কাঠামোতে, রুচির মাপকাঠিতে, সংস্কৃতির মাপকাঠিতে পুরুষ এবং নারী উভয়েই যদি উন্নত জীবনের অধিকারী না হয়, সুন্দর জীবন পুরুষের পক্ষেও গ্রহণ করা সম্ভব নয়, নারীর পক্ষেও সম্ভব নয়। সে সম্পদ সমাজের পক্ষেও লাভ করা সম্ভব নয়। তাই নারীর শিক্ষা, নারীর স্বাধীনতা, নারীর অধিকার, নারী মুক্তির জন্যই শুধু নয়, এর চেয়েও একটা বড় প্রয়োজন রয়েছে — এই কথা মানবতাবাদী এথিক্স নিয়ে এল। এই দৃষ্টিভঙ্গি আপনারা শরৎ সাহিত্যে পাবেন।

এছাড়া মানবতাবাদ একটা সময়ে 'ইমপারসোনাল মাদারহুড'-এর ধারণা নিয়ে এসেছে, সেটাও শরৎ সাহিত্যে পাবেন। তাই দেখুন, 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'মেজদিদি' — এই বইগুলোর মধ্য দিয়ে ইমপারসোনাল মাদারহুড-এর যে ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন, তা কি শুধু 'নারীর মর্যাদাকে তিনি ওপরে তুলে ধরেছেন' — এই কথা বললেই বোঝা যায়? এই বইগুলোর মধ্য দিয়ে ইমপারসোনাল মাদারহুড যাকে আমরা বলি এথিক্যাল মাদারহুড, তার একটা উন্নত মাপকাঠি তিনি তুলে ধরেছেন। শিক্ষিত মেয়েরা এথিক্স কী, এথিক্যাল মাদারহুড কী, তার ওপর হাজার বক্তৃতা শুনেও যে জিনিস আয়ত্ত করতে পারে না — 'মেজদিদি'-র হেমাঙ্গিনী, 'বিন্দুর ছেলে'র বিন্দুবাসিনী এবং 'রামের সুমতি'র নারায়ণী তা আয়ত্ত করেছে মনের সম্পদ দিয়ে। কোনও হীন স্বার্থবোধই এর থেকে তাদের বিচ্যুত করতে পারে

না। শরৎসাহিত্যের এইসব নারীচরিত্র রক্তের কোনও সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও, যাদের তারা সন্তান হিসাবে দেখেছে, সেই সন্তানের প্রতি তারা সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। বিনিময়ে সত্যিকারের ইমপারসোনাল মাদারহুড-এর আস্বাদটি তারা পেয়েছে। শরৎচন্দ্র যেসব দিকগুলি এইসব গল্পের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তা হল, একটি মেয়ে যদি সত্যিই জীবনে ইমপারসোনাল মাদারহুড-এর সন্ধান পায়, তবে তার প্রকৃতি এবং রূপ-রস-গন্ধ কীরকম হয়? প্রত্যেক মা নিজের সন্তানকে ভালবাসে — সে খানিকটা সংস্কার। কিন্তু, যে নিজের গর্ভজাত সন্তান নয় তার মা হওয়া — শুধু মা হওয়া নয়, এমনকি নিজের সন্তানের চেয়ে তার প্রতি আকর্ষণ বেশি হওয়া — সম্পর্কের এই প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে মাতৃত্বের যে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয় সেই তো মাতৃত্ব — যা আপনারা 'মেজদিদি'-তে পাবেন, 'রামের সুমতি'-তে পাবেন, 'বিন্দুর ছেলে'-তে পাবেন। তিনি বক্তৃতা করে এসব কথা বলেননি, গল্প সৃষ্টি করে রসের মাধ্যমে তত্ত্বের এইসব বড় বড় কথাগুলিই মানুষের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন। তাহলে এগুলি কি শুধুমাত্র গল্প? এ গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে নারীর মর্যাদাবোধের যে ছবি আঁকা হয়েছে, তা সবারই ভাল লাগে। কোনও মেয়েই 'মেজদিদি' পড়ে মেজদিদির বড় জা-এর চরিত্র অনুসরণ করতে চাইবে না। মেয়েরা হেমাঙ্গিনী বা নারায়ণীর মতো হতে পারুক আর নাই পারুক, এ গল্পগুলি পড়লেই তাদের নারায়ণীর মতো বা হেমাঙ্গি নীর মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগবে। এই আকাঙ্ক্ষা জাগার অর্থ কী? হেমাঙ্গিনী এবং নারায়ণীর মতো চারিত্রিক মান অর্জন করার জন্য ঘরের বৌ-ঝিদের মধ্যে যদি প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে — তারা এরকমই হওয়া উচিত বা এটাকেই যদি ভাল মনে করেন, তাহলে সমস্ত পরিবারের মধ্যেই নারীজাগৃতির একটা সত্যিকারের আন্দোলন ঢুকে গেল। সমালোচকরা এসব দেখতে পান না। শরৎসাহিত্যে কোনও তত্ত্ব নেই বলে তাঁরা সমালোচনা করেন। অথচ, তাঁরা ওপর থেকে এমন সব তত্ত্বের কথা বলে থাকেন, যেগুলো ঘরের মধ্যেই ঢুকতে পায় না এবং সেগুলোই তাদের কাছে হল বড় তত্ত্বের কথা। আর, সেই তত্ত্বের কথাগুলো বুদ্ধি দিয়ে আলোচনা করে বোঝার আগেই যখন শরৎচন্দ্র এমন অপূর্ব কৌশলে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন, তা হয়ে গেল তত্ত্ববিবর্জিত! এ এক বিচিত্র অন্তঃসারশূন্য 'ইন্টেলেকচুয়াল' মানসিকতা। যাঁরা শরৎচন্দ্রের সাথে তদানীন্তন অন্যান্য সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের তুলনা করেন, তাঁদের আমি দেখাতে চাই যে, এমন সুন্দর করে এমন মাধুর্যে, এমন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এথিক্যাল মাদারহুড আর এইসব ঘটনাগুলো আর কোনও সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে পারেননি।

শরৎচন্দ্র যদি এই ইমপারসোনাল মাদারহুড-এর আদর্শ কী, তার মধ্য দিয়ে কী মহৎ আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে, প্রত্যেকটা ঘটনা কেন ঘটছে — তার ওপর পাতার

পর পাতা ব্যাখ্যা করে বই লিখতেন, তাহলে এইসব তথাকথিত বিদগ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝতেন যে, হ্যাঁ, এর মধ্যে তত্ত্ব আছে। কিন্তু, শরৎচন্দ্র মনে করতেন, এর দ্বারা শুধু তত্ত্ব হত, কিন্তু সাহিত্য মরত। তিনি মনে করতেন, এই কাজ তখনই তাঁর করার দরকার হত, যদি তিনি বুঝতেন যে, তত্ত্ব বোঝার আগেই গল্পের মধ্য দিয়ে রস সৃষ্টি করে তত্ত্বের সেই মূল মর্মবস্তু মানুষের মধ্যে তিনি ঢোকাতে পারেন না — সে কৌশল, সে কায়দা তাঁর আয়ত্তে নেই। কিন্তু, শরৎচন্দ্রের সে কায়দা আয়ত্তে ছিল। তাই তাঁকে সে রাস্তা নিতে হয়নি। বরঞ্চ, তিনি মনে করতেন, যেখানেই তিনি রসের মধ্য দিয়ে তত্ত্বের মূল কথাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না বলে মনে হবে, সেখানেই বুঝতে হবে, তাঁর সাহিত্য পরিবেশনের ক্ষমতা, যাকে আমরা সাহিত্যশৈলী বা শিল্পশৈলী বলি, তা কম বা জিনিসটাই হয়তো তিনি ভাল বোঝেননি। যদি তিনি জিনিসটা ঠিকঠিক বুঝতেন, তাহলে তাকে ভালভাবে তিনি উপস্থাপনা করতে পারবেন না কেন? এই ছিল তাঁর মানসিকতা।

বৈকুণ্ঠের উইল ঃ গোকুল চরিত্রের উন্নত সাংস্কৃতিক মান

দেখুন, 'বৈকুণ্ঠের উইল' শরৎচন্দ্রের একটা ছোট্ট সাধারণ বই। ইনটেলেকচুয়ালদের মতে এটা কেবলমাত্র একটা গল্পই, এর পেছনে ভাবনা-চিন্তার খোরাক তেমন কিছু নেই। আমায় কিন্তু বইখানা পড়তে গেলেই দারুণ বিপত্তির সামনে পড়তে হয়। যতবার পড়তে গেছি, বিপদগ্রস্ত হয়েছি। যার জন্য ডাক্তার আমাকে এই বইটা পড়তে বারণ করে। যদি খুব তন্ময় হয়ে পড়ি, তবে আমার মধ্যে একটা প্রচণ্ড 'ইমোশনাল টারময়েল' হয়, কোনওমতেই আমি আমার আবেগকে সংযত করতে পারি না। কারণ বইয়ের ভিতর লুকিয়ে আছে একটা হারানো জিনিস, যা আমরা আজও চাইছি, কিন্তু পাই না। পুরনো দিনের ভ্রাতৃত্বের একটা সত্যিকারের মাধুর্যময় ছবি ওই বইখানাতে পাওয়া যায় যা আমাদের দেশের পরিবারগুলোর মধ্যে একসময় ছিল। আমাদের দেশে তখনকার সামাজিক অবস্থায় বহু দোষের দিক ছিল ঠিক, কিন্তু বহু গুণের দিকও ছিল। সেগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন। কারণ অপর দেশের রুচি নকল করে কেউ বড় হয় না। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিকে ভিত্তি করে আমাদের দেশে তখনকার দিনে যে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ছিল সেই পরিবারগুলোর মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে এবং ভাইবোনে ছিল মধুর সম্পর্ক। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি ভেঙেছে, একান্নবর্তী পরিবারও ভেঙেছে — তার জায়গায় ব্যক্তিগত পরিবার এসে গিয়েছে। এগুলো প্রগতির ধারাতেই এসেছে। ওই একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে দ্বন্দ্বসংঘাতকে কেন্দ্র করে যে সুন্দর মধু উপচে পড়ত, তার রস আজও আমাদের সামনে পরিবেশন করলে আমরা চেখে চেখে উপভোগ করি। আমাদের বুকে টান ধরে। গোকুলকে দেখে মনে হয়, হোক অজ্ঞ এবং

অশিক্ষিত, আমাদেরও যদি অমন একটা ভাই থাকত। দেখুন, বইটার মধ্যে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সহজ সাধারণভাবে এই কথাটা তুলে ধরেছেন — কোনও তত্ত্ব আলোচনা বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শনের কচকচি করে বলেননি। বইটা পড়লেই গোকুলের জন্য পাঠকের মন কাঁদবে, গোকুলকে সে ভালবাসতে শুরু করবে।

গোকুলের চরিত্র চিত্রণের মধ্য দিয়ে আর একটি যে বড় জিনিস দেখাতে চেয়েছেন, তা হল, কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যা বা উচ্চ ডিগ্রি থাকলেই সংস্কৃতির সত্যিকারের খবর এবং আসল সুরটি আয়ত্ত করা যায় না। গোকুলের ছোট ভাই বিনোদ বিএ-তে ফার্স্ট ক্লাস, সোনার মেডেল পেয়েছে। যার গর্বে গোকুল নিজে গৌরবান্বিত, সেই বিনোদ কি সত্যিকারের রুচি এবং সংস্কৃতির খবর রাখে? সে তার নিজের মাকেও কি যথার্থ সম্মান দিতে জানে? সে বাইরের আচরণে লোকদেখানো ভদ্রতা ও শালীনতা বজায় রাখতে শিখেছে মাত্র। সংস্কৃতির আসল খবর সে কতটুকু রাখে? আর, গোকুল শিক্ষার অভাবে আবোল-তাবোল বলে, কিন্তু সত্যিকারের রুচি, সম্ভ্রমবোধ ও সংস্কৃতির যেটা আসল দিক তা সে অশিক্ষিত হয়েও কিছুটা আয়ত্ত করতে পেরেছে। তাই সে তার সৎমা এবং ভাইকে মর্যাদা দিতে জানে, সমস্ত মানুষকেই দিতে জানে। অথচ, বিনোদ উচ্চশিক্ষিত হয়েও এ জিনিস জানে না। গোকুলের চরিত্র এঁকে এই সত্যটিকেই শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন।

অথচ, আমাদের দেশের এই সমস্ত তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা যারা বড় বড় সংস্কৃতির কথা বলে, সেই সমস্ত শিক্ষিত লোকদের ক্ষেত্রে আকছার দেখা যায়, তাদের বউয়েরা তাদের যা ইচ্ছে বুঝিয়ে দিতে পারে এবং তুচ্ছ যৌন সম্পর্কের আকর্ষণে তারা মা-বাবার প্রতি কর্তব্য, পারিবারিক দায়িত্ববোধ সবকিছু ভুলে সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায়। আকছার দেখা যায় তারা বৌ-এর কথায় মাকে ঘর থেকে বের করে দেন। তারা মাকে বলেন, মা আমি হাজার টাকা ঠিকই রোজগার করি, কিন্তু জান তো সংসারের খরচের জন্য এত হাতখরচা লাগে, তা তোমাকে নাহয় গোটা পঞ্চাশেক টাকা দেব, তুমি দেশের বাড়িতে গিয়ে থাক। আর গোকুলের মতো একটা নিরেট মূর্খ, যাকে তার শ্বশুর, তার স্ত্রী, সমস্ত পরিবেশের লোক মূর্খ মনে করে, তাকে কিন্তু কোনওমতেই তার মা এবং ভাইয়ের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে এক চুলও টলানো যায় না। অথচ, যে মা এবং ভাইকে সে মন থেকে শ্রদ্ধা করে এবং ভালবাসে, যাদেরকে কেন্দ্র করে তার সমস্ত কল্পনা এবং চিন্তা ছেয়ে আছে, সেই মা-ও তাকে বোঝে না, ভাই-ও তাকে বোঝে না। তারাও তাকে অপমান করছে, তারাও তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। তার আত্মীয়স্বজন তাকে 'পলিউট' করার চেষ্টা করছে।

বইটার মধ্যে একটা জায়গা বড় করুণ আছে দেখবেন। গোকুলের শ্বশুর তার মেয়েকে হাত করে গোকুলকে বুঝিয়ে দোকানের চাবি হাত করে ফেলেছিল এবং

দোকানের পুরনো কর্মচারী চক্রবর্তীকে তাড়াবার সমস্ত পরিকল্পনাই পাকাপাকি করে ফেলেছিল। গোকুলের শ্বশুর এবং স্ত্রী গোকুলকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, সৎমা তার সর্বনাশ করছে, চক্রান্ত করছে এবং সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচতে হলে চক্রবর্তীকে দোকান থেকে সরাতে হবে। গোকুলও তার অশিক্ষা ও বুদ্ধির দোষে তাদের চাতুর্যের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলল এবং বুঝে ফেলল যে, হ্যাঁ, তাইতো — এ তো সৎমা, সেইজন্যই তাকে দেখতে পারে না। শ্বশুর ও বৌ-এর পরামর্শে সে চক্রবর্তীর কাছ থেকে দোকানের চাবি নিয়ে নিল। গোকুলের শ্বশুর বুঝল যে, সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, জামাই ও দোকান তার কুক্ষিগত হয়ে গেল। গোকুলের বৌ-ও খুব খুশি হল। সে-ও ভাবল যে, যাক এতদিনে মায়ের কব্জা থেকে সে তার স্বামীকে নিজের আয়ত্তে আনতে পেরেছে। ফলে, তার মধ্যেও একটা প্রবল বিজয়গর্ব হল।

অথচ যে গোকুলকে তার বৌ চিনতে পারেনি, শ্বশুর চিনতে পারেনি, মা-ও চিনতে পারেনি — সেই গোকুলকে দোকানের সামান্য কর্মচারি হয়েও চক্রবর্তী কিন্তু ঠিকই চিনেছিল। সে কোনও কথা না বলে তৎক্ষনাৎ গোকুলের মায়ের কাছে গিয়ে 'বাবু তাড়িয়ে দিয়েছে' বলে সব ঘটনা তাকে জানাল। মা চক্রবর্তীকে আসতে বলে বাইরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, "গোকুল"। ভেতরে তখন গোকুলের শ্বশুর এবং স্ত্রী কাজ হাসিল হয়ে গেছে বলে মহানন্দে আছে। গোকুল কিন্তু মায়ের ডাক শুনেই 'মা ষড়যন্ত্র করছে', 'সর্বনাশ করছে' বলে যে সব কথা সে বুঝে ফেলেছিল, সমস্ত ভুলে গিয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে জবাব দিল, "কি মা"। মা বললেন, "চক্রবর্তী মশাই অনেক দিনের লোক, তিনি যতদিন বাঁচবেন আমি ততদিন তাকে বহাল রাখলুম। সিন্দুকের চাবি খাতাপত্র নিয়ে তাকে দোকানে যেতে দাও"। গোকুল সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে চাবিটা বের করে ঝনাৎ করে ফেলে দিল। চক্রবর্তী একটু মুচকি হেসে চাবির গোছাটি নিয়ে চলে গেল। তারপর শুরু হল গোকুলের ওপর অশেষ লাঞ্ছনা এবং তিরস্কার। গোকুল সমস্ত কিছু নীরবে সহ্য করে বসে রইল। শুধু মুখ কাঁচুমাচু করে একটা কথাই সে বলল, "মা যে শত্রুতা করে এমন একটা হুকুম দেবেন তা আমি কি করে জানব?" দেখুন কী অদ্ভুত! যে সৎমা শত্রুতা করছে, সর্বনাশ করছে, চক্রান্ত করছে — এইসব কথা গোকুলকে বুঝিয়ে সবই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সেই মা-ই যখন একবার মাত্র চক্রবর্তীকে চাবিটা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গোকুলকে বলে চলে গেলেন — অমনি সব ওলটপালট হয়ে গেল। ব্যস্, আর দোকানে হাত দেওয়া চলল না। বউয়ের কর্তৃত্ব, শ্বশুরের কর্তৃত্ব কিছুই চলল না। এই হচ্ছে গোকুল।

অথচ, এইসব তথাকথিত উচ্চরসিকরা এর মধ্য থেকে কোনও রস পায় না, কোনও মূল্যবোধ পায় না। কোনও তত্ত্ব তারা এর মধ্যে দেখে না। তাই আমি

বলছিলাম, তারা সংস্কৃতির শুধু কতগুলো বড় বড় কথা শিখেছে, যাকে আমি বলি কথার ফুলঝুরি, সংস্কৃতির আসল জিনিসের সন্ধান তারা পায়নি। তাই ব্যক্তিগত জীবনটাও তাদের এইরকম। তারা জীবনে কোনও কিছুই ত্যাগ করেনি। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে তাদের দেখা পাওয়া যায়নি। আবার আজ যখন দেশে মানুষ অন্যায় এবং অবিচারের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়ছে, তখন এইসব সংস্কৃতিবানরা সেই লড়াইয়ের থেকে শত হস্ত দূরে সরে গিয়ে নিশ্চিন্তে আরামে যত পারে বড় বড় বাণী দিয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে — আমি জানি না তারা এসব করেন কি না — হয়তো সম্পত্তির জন্য মাকে পথে বসানো, ভাইকে ব্যবসা-বাণিজ্যে ডোবানো প্রভৃতি যা যা মহৎ গুণাবলি একজন সংস্কৃতিবানের থাকা দরকার, তার সবই তাদের আছে। সাথে সাথে সংস্কৃতির কী কী সূক্ষ্ম আবেদন তা নিয়ে তত্ত্ব আলোচনাও তাদের আছে। সংস্কৃতির ভিত্তিটা যাদের এইরকম, তারাই গোকুলের চরিত্র থেকে কোনও মূল্যবোধ খুঁজে পায় না।

তাই গোকুলের মধ্য দিয়ে শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, বইপড়া শিক্ষার সঙ্গে সবসময় সংস্কৃতির মূল সুরটি জড়িয়ে নেই। মহাশিক্ষিত, অথচ সংস্কৃতির কোনও সন্ধানই পায়নি, মনুষ্যত্বের কোনও সন্ধানই পায়নি, এমন মানুষ প্রায়ই দেখা যায়। অথচ, গোকুল লেখাপড়া একদম না শিখেও মনুষ্যত্বের যে আসল মর্মবস্তু তার সন্ধান পেয়ে গেছে এবং তাকে বর্মের মতো রক্ষা করে চলেছে। অশিক্ষার জন্য হয়তো তার প্রকাশ অনেক সময় কটু হয়ে যায়। কিন্তু, যার চোখ আছে, সত্যিকারের রসগ্রাহী মন যার আছে, গোকুলকে চিনতে তার ভুল হয় না। তাই শিক্ষিত হয়েও বিনোদ মাকে মর্যাদা দিতে পারেনি। অথচ, যে মা তাকে অমর্যাদা করে বলে শেষ পর্যন্ত গোকুলকে ছেড়ে বিনোদের সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, সেই গোকুলই মায়ের মর্যাদা রক্ষা করেছে। হাজার চেষ্টা করেও মায়ের বিরুদ্ধে গোকুলকে কেউই কুক্ষিগত করতে পারেনি, এমনকি তার স্ত্রীও না। হাজার মূর্খ হলেও মায়ের মর্যাদা গোকুলই রক্ষা করেছে, গোকুল ছাড়া মায়ের মর্যাদা রক্ষা করার এবং মায়ের জন্য ভাবার আর লোক ছিল না। এই যে ছোট্ট একটা কাহিনীকে কেন্দ্র করে মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ, ভাইয়ের প্রতি ভালবাসার ছবি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন, তা আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে গেছে। অথচ, শিক্ষা তো এই মূল্যবোধগুলিকে আরও প্রস্ফূটিত করবে। যে সংস্কৃতির আলোচনা আমরা করি এবং বড় বড় কথা বুঝি বলে আমরা বড়াই করি, সেগুলো ঠিক ঠিক বুঝলে তো তার দ্বারা মানুষের যে সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোতে নাড়া দিলেই চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে, সেই অনুভূতিগুলো আমাদের আরও সূক্ষ্মতর হবে, আরও প্রস্ফূটিত হবে। কিন্তু, আমি তো দেখছি, শিক্ষা-সংস্কৃতির গমকে এগুলো আমাদের মরছে। তাহলে এর দ্বারা কি যথার্থ শিক্ষা হচ্ছে, না যথার্থ সংস্কৃতি হচ্ছে? নাকি, তার নামে দেশের অনিষ্ট

হচ্ছে।

আর দেখাতে চেয়েছেন প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব কী? একথা ঠিক যে, যে সামাজিক কাঠামোটাকে ভিত্তি করে সত্যিকারের ভ্রাতৃত্বের সৌন্দর্যের একদিন এমন বিকাশ ঘটেছিল, সেই সমাজ আর ফিরে আসবে না। আজ পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় পুরনো একান্নবর্তী পরিবারের বদলে নতুন ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাইয়ে ভাইয়ে সেই সুন্দর সম্পর্কটা না থাকার কারণ কী? একের অন্যের ওপর আর্থিক নির্ভরশীলতা না থাকলে পরস্পরের প্রতি ভালবাসার অনুভূতি এবং স্নেহের সম্পর্ক তো আরও উন্নত হওয়ার কথা। সেখানে আগে যা ছিল, তার থেকেও হীন, স্বার্থসম্পন্ন, নিম্নরুচির জিনিস আসবে কেন? তাই শরৎচন্দ্র গোকুলকে এমন একটা মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছেন, যে তার নিজের উপরে শত অপমান হলেও, তার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, সে কোনও মানুষকে অপমান করে না। মানুষকে সে যথার্থই ভালোবাসে এবং কীভাবে অন্যকে ভালবাসা দিতে হয় লেখাপড়া না জেনেও একটা মানুষ তা আয়ত্ত করেছে। অর্থাৎ রুচির মূল জিনিসটা সে আয়ত্ত করেছে। তাই মায়ের সম্ভ্রম কীভাবে রক্ষা করতে হয়, তা সে জানে। তার শ্বশুর হাজার চেষ্টা করেও ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাকে দিয়ে তার মায়ের অমতে কাজ করাতে পারে না। তার নিজের স্ত্রীও পারে না। অথচ, আমাদের দেশের শিক্ষিত, তথাকথিত রবীন্দ্র সংস্কৃতির উদ্গাতারা পর্যন্ত স্ত্রীর অন্যায় আবদারে কত কাণ্ড করছে। আর একটা অশিক্ষিত লোক, যাকে কথার প্যাঁচে ফেলে সব করানো যায় বলে মানুষ মনে করে, তার একটা জায়গায় কেমন অতি সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ। সেখান থেকে তাকে কেউ কোনওমতেই নড়াতে পারে না। শরৎচন্দ্র এই সামান্য গল্পটির মধ্য দিয়ে যে কথাটি বলতে চেয়েছেন, তা হল, লেখাপড়া একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, কিন্তু সংস্কৃতির মূল সুর শুধুমাত্র উচ্চ ডিগ্রি হলেই আয়ত্ত করতে পারা যায় না। তাই বিনোদ একজন 'গোল্ড মেডালিস্ট' হয়েও যার খবর পায়নি, মূর্খ গোকুল কিন্তু তার সংবাদ পেয়েছে। শুধু তাকে সে প্রকাশ করতে জানে না। মানুষ তাকে ভুল বোঝে, অনেক বিপত্তির সৃষ্টি হয়, ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা গুছিয়ে বলতে পারে না বলে যা চায় তা গড়ে তুলতে পারে না — ভেঙে যায়। এইখানেই শিক্ষার প্রয়োজন। এইখানে তিনি বলতে চেয়েছেন, মূর্খ থাকার অনেক বিপদ এবং মূর্খ থেকে কিছুই হয় না। কিন্তু শুধু লেখাপড়া শিখে ডিগ্রি নিলেই কি সংস্কৃতির সুরটি আয়ত্ত করা যায়? দেখ তো, বিনোদ কি সংস্কৃতিবান, উচ্চ সংস্কৃতি ও মানসিক গুণের অধিকারী? না, এই মূর্খ গোকুল মানবিক গুণের বেশি অধিকারী? তোমরা লেখাপড়া শিখে বিনোদ না হয়ে গোকুল যদি হতে পার তবেই পড়ার সার্থকতা আছে। আর না পড়েও অন্তত গোকুল হতে পারলে বিনোদের চেয়ে সমাজে তার

কার্যকারিতা অনেক বেশি। সে মায়ের মর্যাদা বোঝে। যৌনতার সে দাস নয়। বউয়ের কথায় মাকে ভাইকে সে কখনও পথে বসাবে না। অথচ, আজকের দিনের আমাদের দেশের এইসব তথাকথিত কমিউনিস্টদের এবং প্রগতিশীল আন্দোলনের লোকদের মাকে পথে বসিয়ে বউকে নিয়ে ফ্ল্যাটে ওঠা দেখতে দেখতে আমার চুল পেকে গেল। বয়স তো আমারও কম হল না।

কোন চরিত্রগুলি বিকাশের পথে কমিউনিস্ট হতে পারে

ওই একটা সাধারণ গোকুলকে ভাল করে বারবার পড়ে যারা বুঝতে পারবে, তারাই বুঝতে পারবে আজকের দিনে কমিউনিস্ট হতে গেলে, বিপ্লবী হতে গেলে নৈতিকতার মানটা কত উন্নত হওয়া দরকার। যে আধুনিক সমাজের পরিবর্তন আনতে চাইবে, চিন্তা-ভাবনায় নিজেকে যে বড় মানুষ বলে দাবি করবে, সে যদি গোকুলই না হতে পারে, তাহলে সে বড় মানুষ হতে পারবে না— চূড়ান্ত বোকামি এবং অশিক্ষার দরুণ তার আপাতদৃষ্ট অশালীন উক্তি ও অর্থহীন আচরণের মধ্যেও যে একটা সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক মান ও নৈতিক আধার বর্তমান তা যারা লক্ষ করতে পারল না, তার থেকে যারা কিছুই শিখতে পারল না— তারা কি কোনওদিন কমিউনিস্ট হতে পারে? গিরীশ এবং যাদবই যারা হতে পারল না, তারা কখনও কমিউনিস্ট হতে পারে না। আমাদের সমাজে যাদবকে, গিরীশকে যে বোঝে, গোকুলকে যে বোঝে, বুঝে যে তার সবটুকু রস নিঙড়ে নিয়ে তার সীমাবদ্ধতা বুঝতে পেরে তার থেকে আরও এগিয়ে গিয়েছে — সেই তো হবে কমিউনিস্ট। যারা গোকুলই হতে পারেনি— যারা বিনোদ এবং হরিশের জাত — গোকুলের চরিত্রে যে সংস্কৃতির সুরটি নিহিত, তার খবরই যারা রাখে না, তারা কমিউনিজমের বুকনির আড়ালে কমিউনিস্ট হয় নাকি? বিনোদের দল, হরিশের দল কমিউনিস্ট হয় না। গোকুল, যাদব, গিরীশের দলই বিকাশের পথে কমিউনিস্ট হয়। নারীদের মধ্যে বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী, 'নিষ্কৃতি'-র ছোটো বউ, বড় বউ— এই জাতের নারীরাই বিকাশের পথে কমিউনিস্ট হতে পারে। নারায়ণীর মা এবং 'নিষ্কৃতি'-র মেজবৌ এর জাতটা কমিউনিস্ট হয় না, হতে পারে না। লেখাপড়া শিখলেও পারে না। লেখাপড়া শিখলে এই ধরনের মেয়েরা বড়জোর 'শেষ প্রশ্ন'-র বেলা হবে, কমল হবে না। কমলের জাতটা জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিকাশের পথে কমিউনিস্ট হয়।

যেসব সাহিত্যিক তাঁদের সাহিত্যের মধ্যে অন্তঃসারশূন্য কতকগুলো বড় বড় বক্তৃতা করেন এবং যেসব সাহিত্য সমালোচক সেইসব বড় বড় কথাগুলির মাপকাঠিতেই বিচার করেন শরৎসাহিত্যের চেয়েও সেইসব সাহিত্য কত বেশি প্রগতিশীল — আসলে কিন্তু সেইসব সাহিত্যিকরা এবং সাহিত্য সমালোচকরা উভয়েই হচ্ছেন ওই 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর বিনোদ এবং 'নিষ্কৃতি'র হরিশ ও

মেজবৌ-এর জাত। এইসব সাহিত্যিকরা ও সাহিত্য সমালোচকরা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলোর তাৎপর্যই ধরতে পারেননি।

শরৎচন্দ্রকে বিস্মৃত হয়ে আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি

আমি তেমন সাহিত্যিক চাই, যে সাহিত্য সৃষ্টি করে উন্নত রসের মাধ্যমে বলবে যে, বুর্জোয়া মানবতাবাদের যত বড় উদার ভাবনা-ধারণাই হোক এবং বুকনিতে তা যত বড়ই হোক, তা মূলত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতাবোধের সঙ্গে জড়িত। মানবতাবাদী ভাবনা-ধারণাকে এবং তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিকে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির মানসিকতা থেকে মুক্তি দিলেই সর্বহারা সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটবে এবং তা জয়যুক্ত হবে। কিন্তু এই সর্বহারা সংস্কৃতিকে জয়যুক্ত করতে হলে আগে আর্থিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষকে বিজয় অর্জন করতে হবে এবং তার জন্য সর্বহারা বিপ্লব তাকে সম্পন্ন করতে হবে। একমাত্র এই কাজটি করতে পারলেই মানুষ সামাজিক ক্ষেত্রে সর্বহারা সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। ফলে, আজকের প্রগতিশীল সাহিত্য মানুষের মধ্যে সর্বহারা সংস্কৃতির 'ইন্ডিকেটিভ' (মৌলিক) দিকগুলো তুলে ধরবে। একই সাথে সর্বহারা সংস্কৃতি, নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে, তার সাথে বুর্জোয়া মানবতাবাদী সংস্কৃতির যে মূল্যবোধগুলি আজও এই জরাগ্রস্ত সমাজে মানুষের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠা, সংগ্রামমুখীতা, যে কোনও অবস্থার মধ্যে হীনমন্যতা স্বীকার না করে এবং মর্যাদা বিলুপ্ত না করে লড়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে — বুর্জোয়া মানবতাবাদের সেইসব উপাদানগুলি এমনকি গ্রামীণ জীবনে আজও ধর্মীয় মূল্যবোধের যে জিনিসগুলো মানুষকে নিঃসংশয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়বার সাহস জোগাবে, সেগুলোকেও ব্যবহার করতে হবে, নিতে হবে, মেলাতে হবে। কিন্তু সাথে সাথে মানবতাবাদী বা ধর্মীয় মূল্যবোধের সীমা কোথায় এবং সর্বহারা সংস্কৃতির সাথে তার বিচ্ছেদ কোথায়, বিরোধ কোথায় তা দেখাতে হবে। তাহলে আজকের দিনে প্রগতিশীল সাহিত্য হতে হলে একদিকে চিন্তাগত দিক দিয়ে, বিশ্লেষণ দিয়ে এইটি দেখাতে হবে, আর তার রসের ফর্মটা, বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ ফর্মের চেয়েও উন্নত স্তর, রসঘন স্তর হতে হবে। এই কাজটি একমাত্র সাহিত্যিকই পারে, আমি পারব না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু, আমি বুঝতে পারি, এইখানেই সর্বহারা সংস্কৃতির আসল বিষয়টি নিহিত। কাজেই প্রগতিশীল সংস্কৃতির নামে আজকাল যেসব ফাঁকির কারবার চলছে, তার কোনও মূল্যই আমার কাছে নেই। ফলে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন হলে, শরৎচন্দ্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে থাকলে আজকের দিনে সমগ্র দেশে যে নৈতিকতার অধঃপতন ঘটেছে এবং যার প্রভাব বামপন্থী আন্দোলনেও এসে বর্তাচ্ছে — সেই নৈতিকতা একটা নতুন মানে খুঁজে পাবে। তার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন

আসবে। আধুনিক সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যেও একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে।

আমাদের দেশে আজ যদি যুগের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে সর্বহারার সংস্কৃতি, সর্বহারার সাহিত্য — যাকে আমরা বলতে পারি, এদেশের রবীন্দ্রোত্তর শরৎ-উত্তর সাহিত্য — তা যদি গড়ে তুলতে হয়, তা তখনই গড়ে তোলা সম্ভব যখন মানবতাবাদী সাহিত্যের ওই সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক ধারাটি যা শরৎসাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তাকে আপনারা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন এবং তাকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত করে ফেলতে পারবেন। অর্থাৎ তার রস সম্পূর্ণভাবে নিংড়ে নিয়ে তাকে হজম করে তার ছোবড়া ফেলে দিতে পারবেন। তখনই আপনারা আজকের যুগের উন্নততর সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারবেন। কারণ, সর্বহারা সংস্কৃতি মানবতাবাদী সংস্কৃতির থেকে নিম্নস্তরের হলে — অর্থাৎ, রবীন্দ্র-শরৎসাহিত্যের থেকে নিম্নস্তরের রুচির মানকে প্রদর্শিত করলে তা শুধু চলবে না তা নয়, এ মজুর আন্দোলনেরও কোমর ভেঙে দেবে এবং তা শেষপর্যন্ত বুর্জোয়াদেরই সুবিধা করে দেবে। বুর্জোয়া সমাজকে শ্রমিক কখনও ভাঙতে পারে না তার থেকে ছোট জিনিস দিয়ে। বুর্জোয়া মানবতাবাদ যা সৃষ্টি করেছে — আদর্শের ক্ষেত্রে, রাজনীতির ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, সমস্ত দিক থেকে তার চাইতে উন্নততর জিনিস দিয়ে যখন আঘাত করা যাবে — কেবলমাত্র তখনই শ্রমিক আন্দোলন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে ভাঙতে পারবে। কাজেই তদানীন্তন সমাজে সবচেয়ে বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদী চিন্তা যে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে এবং চিন্তা, শিল্পগত মান এবং রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই সাহিত্য যে উচ্চমান গড়ে তুলেছে — আজকের দিনের সর্বহারা সংস্কৃতির উত্তরসাধকরা যদি সেই সাহিত্যকে উপযুক্তভাবে অনুধাবন করতে না পারেন, তাহলে সর্বহারাশ্রেণির সাহিত্যও তাঁরা ফর্মূলা মাফিক তৈরি করবেন, তার স্বরূপ তাঁরা ধরতে পারবেন না।

শরৎসাহিত্যকে আমরা ঠিকমতো উপলব্ধি করলে আজকের প্রগতিশীল আন্দোলনে নীতি-নৈতিকতার একটা ভিত্তি তৈরি হবে। পরস্পর মতগুলোর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সত্যকে পাওয়ার একটা রাস্তা আমরা খুঁজে পাব। শরৎচন্দ্রকে বিস্মৃত হওয়ার ফলেই আজকের দিনের রাজনৈতিক আন্দোলন, গণআন্দোলন, সাহিত্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে নীতি-নৈতিকতা, রুচি-সংস্কৃতির উঁচু মানটা নেমে গিয়েছে, যে উঁচু মানটা একসময় এদেশে গড়ে উঠেছিল তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি। তাই আমরা বড় কথা বলি, কিন্তু বড় হৃদয়বৃত্তির কারবার করি না। কোনও আন্দোলনই তো শুধুমাত্র বুদ্ধির কারবার নয়, শুধু উচ্চ চিন্তার কারবার নয়— বুদ্ধি এবং উচ্চ হৃদয়বৃত্তির কারবার। চিন্তা এগিয়ে যাচ্ছে— সেখানে হৃদয়বৃত্তির আধারটা নিচু স্তরে নেমে থাকলে তো ব্যবধান হয়ে যাবে। তাহলে আন্দোলন এবং চিন্তাও শেষ পর্যন্ত বিপথগামী হবে। ফলে পথ পাওয়া

যাবে না। আজকের দিনে ভারতবর্ষের গণআন্দোলনে স্তরে স্তরে যে নীতি-নৈতিকতা নেই— এই সত্য আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ করছি। আপনারা জানেন, আমি রাজনীতি করি। আমি একজন বামপন্থী আন্দোলন এবং সাম্যবাদী আন্দোলনের লোক। এঁরা আমাকে কেন সাহিত্যসভায় ডাকেন তা এঁরাই ভাল জানেন। মাঝে মাঝে টেনে আনেন বলে আসতে হয়। কিন্তু, এই আন্দোলনের মধ্য থেকে একটা কথা আমাকে বারবার খুব ধাক্কা দিচ্ছে। তা হচ্ছে, এর নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতির সুর এবং আধার ধসে গিয়েছে। তাই আজ শুধু স্লোগান সর্বস্ব রাজনীতি হচ্ছে। ফলে, বারবার গমকে গমকে ফুলে ফুলে আসছে আন্দোলন—'পরিবর্তন চাই', 'বিপ্লব চাই' বলে। মানুষ মরছে, যুবকরা মরছে, কিন্তু বিপ্লব হচ্ছে না। পরিবর্তন আসছে না। এইরকম বিচ্ছিন্ন একান্তভাবে রুচি-সংস্কৃতি বহির্ভূত আন্দোলনে শুধু লড়াই করলে, প্রাণ দিলে তার দ্বারা পরিবর্তন আসে না।

সমাজবিপ্লবের অপূরিত স্বপ্ন সফল করতে শরৎচন্দ্রকে সঠিকভাবে অনুশীলন করতে হবে

সুনির্দিষ্ট সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লক্ষ্যের ভিত্তিতে নীতিভিত্তিক আন্দোলন হলে তবেই জাতির মেরুদণ্ড খাড়া হবে। একটা জাতি মার খেয়েও উঠে দাঁড়াতে পারে, হাজার বছরের কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা থেকেও একটা জাতি কোমর সিধে করে উঠে দাঁড়াতে পারে, না খেয়েও একটা জাতি উঠে দাঁড়ায়, বোমা মেরে মেরে একটা জাতিকে ভেঙে দেওয়া যায় না, যদি সেই জাতির নৈতিক বল সুদৃঢ় থাকে। কিন্তু, নৈতিক বল যদি একটা জাতির ধসে যায়, তাহলে বিক্ষুব্ধ মানুষ না খেতে পেয়ে লড়াই করলেও সে লড়াইয়ের থেকে কিছু দানা বাঁধে না। কোনও স্থায়ী জিনিস দানা বাঁধে না। এইরকম রুচি-সংস্কৃতি এবং নীতি-নৈতিকতা বহির্ভূত শুধু স্লোগান সর্বস্ব আন্দোলনের মধ্যে লিপ্ত মানুষগুলো ক্ষমতা হাতে পেলেও সেই ক্ষমতা রক্ষা করতে পারবে না। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করবে। তুচ্ছ সুযোগ-সুবিধা নিয়ে তারা নিজেরা কাড়াকাড়ি করবে, মারামারি করবে। ক্ষমতায় থেকে নেতারা যেমন সুবিধা নেবে তেমন সকলেই সুবিধা নিতে চাইবে। কেউ দায়িত্ব অনুভব করবে না। তাই আমি রাজনৈতিক আন্দোলনে একটা কথা অনেক আগেই বলেছিলাম যে, গণআন্দোলনের মধ্যে যদি সাংস্কৃতিক মান ধসে যায়, তাহলে শুধু কতকগুলো বড় বড় বিপ্লবের স্লোগান আর বড় বড় তত্ত্বের কথা বললেই বিপ্লবটা সংগঠিত হবে না।

আমি বলেছিলাম, যে কোনও আদর্শ, যে কোনও উচ্চ চিন্তা-ভাবনার, যে কোনও বিপ্লবী দর্শন বা মতবাদের আসল মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতি ও রুচিগত মানের মধ্যে। এই রুচি এবং সংস্কৃতির ধারণাই হচ্ছে যে কোনও বিপ্লবী

আদর্শের মর্মবস্তু এবং প্রাণ। প্রাণহীন দেহ দেখতে সুন্দর হলেও যেমন তার দ্বারা কোনও কাজ হয় না, বরং রেখে দিলে তা পচে গিয়ে সমাজের অনিষ্ট করে— ফলে তাকে ফেলে দিতে হয়, রুচিসংস্কৃতি-বহির্ভূত আদর্শও ঠিক তেমনি। আদর্শের কথাগুলো খুব সুন্দর, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য খুব ভাল, যুক্তি সব ঠিক, কিন্তু তাকে রূপ দেওয়ার জন্য রুচি-সংস্কৃতির এবং চরিত্রের যে আধারটি, যে ভিত্তিটি থাকা দরকার তা নেই, অর্থাৎ তার প্রাণসত্তাটি নেই, তাহলে সেই আদর্শও একটা প্রাণহীন দেহের মতো। প্রাণহীন দেহ সুন্দর বলে, শক্তিশালী দেহ ছিল বলে তাকে মমতা করে আঁকড়ে ধরলে যেমন সে পূতিগন্ধ ছড়ায়, তেমনি এইরকম আদর্শও ধরে রেখে দিলে তা সমাজের অনিষ্ট করে। ফলে তেমন আদর্শকেও ফেলে দিতে হয়, কারণ তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তা ক্ষয়ে গিয়েছে।

শরৎ সংস্কৃতির চর্চা, শরৎচন্দ্রের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আলাপ-আলোচনা আজকের সমাজে এইজন্যই আরও বেশি দরকার যে, আমরা ছিন্নমূল হয়ে পড়েছি। সংস্কৃতির যে উচ্চ আধারটা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তৈরি হয়েছিল, আমরা তার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছি না। বড় কথাগুলো আমরা বিশ্বের থেকে আহরণ করছি। কিন্তু, দেশের মাটিতে গড়ে ওঠা উচ্চ সংস্কৃতির সুরের সঙ্গে আমরা যেন যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। সেই যোগসূত্রটি গড়ে তুলতে হবে। অথচ তার সঙ্গে আজ বিরোধও অবশ্যম্ভাবী। কারণ, শরৎচন্দ্র ছিলেন পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদ এবং মানবতাবাদের উপাসক। আর, আমাদের করতে হবে শ্রমিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, পুঁজিবাদ উচ্ছেদের বিপ্লব। কাজেই সে বিপ্লবের সাধনায় আমাদের আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু, আমরা এগিয়ে যেতে তখনই পারব যখন আমরা শরৎচন্দ্রকে বুঝেছি এবং বুঝে তার সমস্ত রসটুকু নিংড়ে নিয়ে তার ছিবড়েটা ফেলে দিয়েছি, তার অকার্যকরী দিকটা ফেলে দিয়েছি। তার মধ্যে যা কিছু সম্পদ ছিল— সমস্ত সম্পদগুলো নিয়ে আমরা নিঃশেষিত করে ফেলেছি। আর আমাদের নেওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমরা নিতেই পারলাম না কিছু। আমরা যোগসূত্রই হারিয়ে ফেললাম। শরৎচন্দ্রের স্তরের উন্নত মানসিকতা এবং মূল্যবোধগুলিই আমাদের মধ্যে নেই, তাহলে আমরা আজকের দিনের বিপ্লবের সৈনিক হব কী করে? তাই আমাদের শরৎচন্দ্রকে ভালভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে। □